কিং কং

হেমেন্দ্রকুমার রায়

কিং কং

এক । চিন-সমুদ্রের টাইফুন

জাহাজের নাম ইন্ডিয়া। আমেরিকা থেকে জাপান হয়ে আসছিল ভারতবর্ষের দিকে। হঠাৎ চিনা সমুদ্রে টাইফুনজেগে উঠল। চিনা সমুদ্রে ভীষণ এক ঝড় ওঠে, তার নাম হচ্ছে টাইফুন। খুব সাহসী নাবিকরাও এই টাইফুন-কে ভয় করে যমের মতো। টাইফুন এর পাল্লায় পড়ে আজ পর্যন্ত কত হাজার হাজার জাহাজ যে অতল পাতালে তলিয়ে গিয়েছে, সে হিসাব কেউ রাখতে পারেনি।

ঝড় গোঁ গোঁ করে গর্জন করছে–চারিদিক অন্ধকার! ঝড়ের আঘাতে সমুদ্র প্রচণ্ড যাতনায় আর্তনাদ করতে লাগল–পৃথিবীতে এখন ঝড়ের হুঙ্কার আর সমুদ্রের কান্না ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। যেন ঝড়ের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যেই বিরাট এক ভীত জন্তুর মতো সমুদ্র বারংবার আকাশে লাফ মারতে লাগল।

ঝড়ের তোড়ে ইন্ডিয়া জাহাজ অন্ধকারে কোথায় যে বেগে ছুটে চলেছে, কেউ তা জানে না! জাহাজের ইঞ্জিন যখন ইন্ডিয়াকে আর সামলাতে পারলে না, কাপ্তেন ঈঙ্গলহর্ন তখন হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশভাবে বললেন, ভগবান আমাদের রক্ষা করুন!

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই–পৃথিবীর কোথাও এতটুকু আলো আভাস নেই! জাহাজ ছুটে চলেছে যেন মৃত্যুর মুখে!

টাইফুন-এ প্রতি বৎসরে চিনা সমুদ্রে কত জাহাজই ডোবে, হয়তো ইন্ডিয়া জাহাজও আজ ডুববে, কিন্তু কেবল সেই কথা বলবার জন্যেই আজ আমরা এই গল্প লিখতে বসিনি।

ইন্ডিয়া জাহাজের দুটি যাত্রীর জন্যেই আমাদের যত দুর্ভাবনা।..কারণ তাঁরা বাঙালি। একজনের নাম শ্রীযুক্ত শোভনলাল সেন, আর একজন হচ্ছেন তারই ভগ্নী কুমারী মালবিকাদেবী। ভাই-বোনে আমেরিকা বেড়িয়ে দেশে ফিরছেন।

শেষ রাতে ঝড় থামল, সমুদ্রও শান্ত হল।

কাপ্তেন ঈঙ্গলহর্ন বললেন, ভগবানকে ধন্যবাদ! এ যাত্রা আমরা রক্ষা পেলুম!

তার সহকারী কর্মচারী বললেন, কিন্তু জাহাজ যে কোথায় এসে পড়েছে, সেটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

কাপ্তেন বললেন, না। তবে আমরা যে এখনও পৃথিবীতেই টিকে আছি, এইটুকুই হচ্ছে ভাগ্যের কথা। বেঁচে যখন আছি, তখন জাহাজ নিয়ে আবার ডাঙায় গিয়ে উঠতে পারব।

কর্মচারী বললেন, ও কীসের শব্দ?

কাপ্তেন খানিকক্ষণ কান পেতে শুনে বললেন, অনেকগুলো জয়ঢাক বাজছে! বোধহয় আমরা কোনও দ্বীপের কাছে এসে পড়েছি। চারিদিকে যে অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হয়তো ওখানে কোনও উৎসব হচ্ছে..আচ্ছা, আগে রাতটা পুইয়ে যাক, সকালে সবই বুঝতে পারব!

দুম দুম দুম, দুম দুম দুম, দুম দুম দুম! জয়ঢাকগুলো অশান্ত স্বরে বেজেই চলেছে। শোভনলাল আর মালবিকা ডেকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সেই রহস্যময় বাজনা শুনতে লাগল।

খানিক পরে মালবিকা বললে, দেখ দাদা, কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে যেন ও বাজনা আমাকেই ডাকছে।

শোভনলাল হেসে ঠাট্টা করে বললে, দূর পাগলি!

.

দুই । খুলি-পাহাড়ের দ্বীপ

ঢাক-ঢোল একটানা বেজে চলেছে–এ ঢাক-ঢোল যেন থামতে শেখেনি!

পূর্বদিকে আলো-নদীর একটি উজ্জ্বল ধারা বয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখনও তার নিচেই দুলছে অন্ধকারের পর্দা।

আলো-নদীর দুই তীরে ধীরে-ধীরে রক্তরাঙা রঙের রেখা ফুটে উঠেছে।

ক্রমে অন্ধকারের পরদা পাতলা হয়ে এল এবং তারই ভিতর থেকে অস্পষ্ট ও ছায়াময় সব দৃশ্য দেখা যেতে লাগল!

ভোর। সূর্যের কিরণ-ছটা দেখা গেল।

শোভন ও মালবিকা বিস্মিত চক্ষে দেখলে, তাদের সামনেই একটি অর্ধচন্দ্রাকার দ্বীপ আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বীপের মাঝ থেকে মস্তবড় একটা পাহাড় মাথা তুলে আকাশের অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে। সে পাহাড়ের ওপরটা দেখতে ঠিক মড়ার মাথার খুলির মতো–সেখানে গাছপালা বা সবুজ রঙের চিহ্নমাত্র নেই।

কিন্তু পাহাড়ের নিচেই গভীর জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলের ভিতর থেকে তখনও কারা মহা-উৎসাহে ঢাক-ঢোল বাজাচ্ছে!

কাপ্তেনসাহেব তার প্রধান কর্মচারী ডেনহামকে ডেকে বললেন, মিঃ ডেনহাম! এ কোন দ্বীপ? আমরা কোথায় এসেছি?

ডেনহাম বললে, আমারও জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশি নয়! এখানে মড়ার মাথার খুলির মতন একটা আশ্চর্য পাহাড় রয়েছে। এ দ্বীপের কথা কখনও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না।

জাহাজের ইঞ্জিনচালক এসে খবর দিলে, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। সারাতে সময় লাগবে।

কাপ্তেন বললেন, হয়তো আজ আমাদের এইখানেই থাকতে হবে। ডেনহাম, সময়ই যখন পাওয়া গেল, এই অজানা দ্বীপটা একবার তদারক করে আসতে দোষ কী?

দোষ কিছুই নেই। কিন্তু কাল রাত থেকে শুনেছি ওখানে কারা ঢাক-ঢোল বাজাচ্ছে, এ রহস্যময় দ্বীপে কারা বাস করে, তা জানি না। ওরা যদি অসভ্য নরখাদক হয়? যদি আমাদের আক্রমণ করে?

ঠিকই বলেছ ডেনহাম। বেশ, আমরা দলে ভারী আর সশস্ত্র হয়েই যাব। দুখানা বোট নামাতে বলো। ত্রিশজন নাবিক আমাদের সঙ্গে যাবে। সকলেই যেন বন্দুক নেয়।

শোভন আর মালবিকা দাঁড়িয়ে কাপ্তেনের হুকুম শুনলে।

মালবিকা বললে, আমি কখনও অসভ্য মানুষ দেখিনি! দাদা, আমারও ওই দ্বীপে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শোভন বললে, এ প্রস্তাব মন্দ নয়, মালবিকা। ফাঁকতালে একটা নতুন দেশ দেখার সুযোগ ছাড়ি কেন? রোসো, কাপ্তেনসাহেব কী বলেন শুনে আসি।

কাপ্তেন প্রথমটা নারাজ হলেন। তারপর শোভনের অত্যন্ত উৎসাহ দেখে বললেন, আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে আপনারা যেতে পারেন, কিন্তু না গেলেই ভালো হত।

মালবিকাকে বোটে উঠতে দেখে চার-পাঁচজন মেমও দ্বীপে যাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলে। কিন্তু দ্বীপে অসভ্য নরখাদক থাকতে পারে শুনেই তাদের সমস্ত আগ্রহই ঠান্ডা হয়ে গেল।

দুখানা বোট দ্বীপের দিকে অগ্রসর হল।

ঢাক-ঢোল তখনও বাজছে।

বোট দুখানা খানিকদূর অগ্রসর হতেই দেখা গেল, দ্বীপের জঙ্গল আর সমুদ্রতীরের মাঝখানে প্রকাণ্ড উঁচু একটা পাঁচিল এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে।

শোভন সেইদিকে কাপ্তেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

কাপ্তেন বিস্মিত স্বরে বললেন, অত বড় পাঁচিল দিয়ে জঙ্গলটা আড়াল করে রাখা হয়েছে কেন? এ কী ব্যাপার!

ডেনহাম বললে, এ যে চিনের প্রাচীরের মতন ব্যাপার। চিনারা পাঁচিল তুলেছিল তাতার দস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। কিন্তু এখানে কাদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে এমন পাঁচিল তোলা হয়েছে?

শোভন বললে, আমরা দ্বীপের এত কাছে এসে পড়েছি, তবুও তো ওখানে জনপ্রাণীকে দেখতে পাচ্ছি না!

মালবিকা বললে, কিন্তু ঢাকের বাদ্যির তো বিরাম নেই।

কাপ্তেন বললেন, আর একটা দুটো নয়, শত শত ঢাক বাজছে। আমার বোধহয়, দ্বীপে আজ কোনও মহোৎসব হচ্ছে, বাসিন্দারা সবাই সেখানে গিয়ে জুটেছে।

বোট দুখানা দ্বীপের যত কাছে আসে, সেই আশ্চর্য প্রাচীরের উচ্চতা ততই বেড়ে ওঠে।

শোভন বললে, পাঁচিলটা দেড়শো ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না! দেখুন, বড় বড় গাছগুলো পর্যন্ত পাঁচিলের কত নীচে রয়েছে।

কাপ্তেন বললেন, যাদের ভয়ে অত উঁচু পাঁচিল দেওয়া হয়, তাদের প্রকৃতি নিশ্চয়ই ভয়ংকর! মিঃ সেন, আপনার ভগ্নীকে আমাদের সঙ্গে না আনলেই ভালো করতুম!

মালবিকা হেসে বললে, আমার কিন্তু একটুও ভয় করছে না। মিঃ ঈঙ্গলহর্ন!

কাপ্তেন বললেন, আপনার ভয় না করতে পারে, কিন্তু আমি ভাবছি আমার দায়িত্বের জন্যে!

বোট ডাঙায় এসে লাগল। কিন্তু তখনও দ্বীপের কোনও মানুষকে দেখা গেল না– কেবল সেই শত-শত অশান্ত ঢাকের আওয়াজই জানিয়ে দিচ্ছিল যে, এখানে মানুষ বাস করে।

কাপ্তেন বোট থেকে নেমে নাবিকদের ডেকে বললেন, বন্দুকে টোটা পুরে তোমরা দুজন-দুজন করে সার বেঁধে অগ্রসর হও। মিঃ সেন, আপনার ভগ্নীকে নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে মাঝখানে থাকুন!

যেদিক থেকে ঢাক-ঢোলের আওয়াজ আসছিল, সকলে পায়ে-পায়ে সেইদিকে এগুতে লাগল।

শোভন বললে, দেখুন মিঃ ঈঙ্গলহর্ন! পাঁচিলটা এখন আরও কত বড় দেখাচ্ছে। আর এ পাঁচিল যে একেলে নয়, অনেক শত বৎসরের পুরোনো, তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে!

কাপ্তেন বললেন, পাঁচিলের গায়ে ওখানে যে একটা মস্তবড় ফটকও রয়েছে! তালগাছের সমান উঁচু ওই ফটকটা কীরকম মজবুত দেখেছেন।

এইবারে সকলে একটা বড় গ্রামের কাছে এসে পড়ল। সারি সারি কুঁড়েঘর, মাঝে মাঝে অলিগলি ও রাস্তা। গ্রামের আকার দেখে আন্দাজে বোঝা গেল, এখানে অন্তত চার পাঁচ হাজার লোক বাস করে। কিন্তু কোথায় তারা? সারা গ্রাম নিস্তব্ধ ও জনশূন্য, কোথাও জীবনের কোনও লক্ষণই নেই।

ঢাক-ঢোলের আওয়াজ তখন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে-সঙ্গে-সঙ্গে মাঝে-মাঝে বহু কণ্ঠের গম্ভীর একতানও শোনা যাচ্ছে-যেন কারা অজানা ভাষায় স্তোত্র পাঠ করছে!

ডেনহাম বললেন, এতক্ষণে মানুষের গলার সাড়া পাওয়া গেল। গাঁ-সুদ্ধ লোক এখানে এসে জুটেছে। দেখা যাক এরা কারা?

গাছপালার ভিতর থেকে প্রায় সত্তর-আশি ফুট উঁচু একটা কাঠের বাড়ি জেগে উঠল।

শোভন বললে, গোলমালটা ওইদিক থেকেই আসছে। ওই কাঠের উঁচু বাড়িটা বোধহয় মন্দির, নয়তো রাজপ্রাসাদ!

সামনেই একটা জঙ্গল। সেটা পার হতেই সকলের চোখের সুমুখে যে দৃশ্য জেগে উঠল, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনই বিচিত্র!

মালবিকা এতক্ষণ খুব স্ফুর্তির সঙ্গে পথ চলছিল, এখন সে আঁতকে উঠে পিছিয়ে পড়ে শোভনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

কাপ্তেনসাহেব হাত তুলে ইশারা করে নাবিকদের হুঁশিয়ার হতে বললেন, নাবিকেরাও তখনি বন্দুক প্রস্তুত করে সাবধান হয়ে দাঁড়াল!

.

তিন । বেড়ো! বেড়ো!

মস্ত একটা কাঠের উঁচু মাচা। তার চারিদিকে কাঠের সিঁড়ি–নানান রকম জীবজন্তুর চামড়ায় ঢাকা!

সেই মাচার টঙে একটি বালিকা ভয়ে জড়সড় হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে কষ্টিপাথরের কালো মূর্তির মত! মেয়েটির মাথায় ফুলের মুকুট, সর্বাঙ্গে ফুলের গহনা!

কাঠের সিঁড়ির ধাপে-ধাপে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো কালো কালো পুরুষ-মূর্তি, তারা সমস্বরে যেন কী মন্ত্র পড়ছে।

মাচার ডানদিকে আর একটা কাঠের বেদি, তার ওপরেও ভূতের মতন কালো একটি লম্বা-চওড়া মূর্তি, তার মাথায় পালকের টুপি, পরনে জন্তুর চামড়া, গলায় মড়ার মাথার মালা। সেও দু-হাত ঊর্ধ্বে তুলে চেঁচিয়ে কী মন্ত্র পড়ছে! বোধহয় সে প্রধান পুরোহিত।

মাচার বাঁ-দিকেও একটা বেদি এবং তার ওপরেও জমকালো পোশাক পরা আর একটি মূর্তি। তার মাথায় মুকুট, হাতে দণ্ড! বোধহয় সে এখানকার রাজা।

নিচের চারিদিকে কাতারে কাতারে লোক স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ! দলে-দলে যোদ্ধা, হাতে বর্শা, কোমরে তরবারি, পিঠে তিরধনুক! শত শত বাজনদার বড় বড় ঢাকে কাঠি পিটছে। প্রত্যেক মূর্তিই প্রায় উলঙ্গ, কোমরে কেবল কপনির মতো এক এক টুকরো ন্যাকড়া ঝুলছে!

হঠাৎ পুরুত মন্ত্র পড়া বন্ধ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। অমনি ভিড়ের ভিতর থেকে জন-বারো মূর্তি বেরিয়ে এসে যে মাচাটার ওপরে সেই ভীত মেয়েটি বসে আছে, তারই চারপাশ ঘিরে লাফাতে লাফাতে তাণ্ডব নাচ শুরু করে দিলে! সে মূর্তিগুলোর প্রত্যেকের মুখেই ভীষণ মুখোশ, গায়ে বড় বড় লোমওয়ালা চামড়া।

ডেনহাম বললে, গরিলা! ওরা গরিলা সেজে নাচছে! এত জীব থাকতে ওরা গরিলা সাজল কেন?

এতক্ষণ ওরা এমন ব্যস্ত হয়েছিল যে, কাপ্তেনসাহেবের অস্তিত্বের কথা কেউ জানতেও পারেনি। কিন্তু এখন রাজদণ্ডধারী মূর্তিটার দৃষ্টি আচম্বিতে নতুন আগন্তুকদের ওপর গিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল–বেডো! বেডো! ড্যামা পেটি ভেগো!

অমনি সমস্ত ঢাক-ঢোল, মন্ত্র পড়া, চিৎকার ও নৃত্য যেন কোনও মায়ামন্ত্রেই একসঙ্গে থেমে গেল! চারিদিক এমনি স্তব্ধ হল যে, একটা আলপিন পড়ার শব্দও শোনা যায়!

সমস্ত লোক হতভম্বের মতো কাপ্তেনসাহেবের দলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল! এবং শিশু ও স্ত্রীলোকরা একে একে ভিড়ের ভিতর থেকে নীরবে সরে পড়তে লাগল।

ডেনহাম এস্তকণ্ঠে বললে, দেখ, দেখ! স্ত্রীলোক আর শিশুরা পালিয়ে যাচ্ছে। গতিক সুবিধার নয়, আমাদেরও এখান থেকে অদৃশ্য হওয়া উচিত!

কাপ্তেন বললেন, আর পালানো চলে না। ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও, আমরা যে ভয় পেয়েছি সেটা ওদের জানতে দেওয়া হবে না।

রাজা ও পুরুত বেদির ওপর থেকে নেমে পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল, তাদের পিছনে-পিছনে আসছে একদল যোদ্ধা। ভিড়ের ভিতরে এখন আর একজনও শিশু কি স্ত্রীলোক নেই।

ডেনহাম্ বললে, এই বনমানুষগুলো এগিয়ে আসছে কেন?

রাজার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে কাপ্তেন বললেন, জানি না।

মালবিকা বললে, হ্যাঁ দাদা, ওরা কি আমাদের আক্রমণ করবে?

শোভন বললে, কেমন করে বলব? কিন্তু আমাদের আক্রমণ করলে ওদেরই বেশি বিপদ হবে। আমাদের বন্দুক আছে।

রাজা ও পুরুত সদলবলে এগিয়ে নাবিকদের সামনে এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ পুরুতের চোখ পড়ল মালবিকার ওপরে! অত্যন্ত বিস্ময়ে খানিকক্ষণ নীরব থেকে আচম্বিতে শূন্যে এক লাফ মেরে সে কী বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল, ড্যামা সি ভেগো! ড্যামা সি ভেগো! কং! কং! কং! টাস্কো!

রাজাও মালবিকাকে দেখে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, কং! কং! কং! টাস্কো!

তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে যোদ্ধার দল ছুটে এসে মালবিকাকে ধরবার উপক্রম করলে।

মালবিকা সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল–দাদা! দাদা!

কাপ্তেন বললেন, বন্দুক ছোড়ো!

একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক গর্জন করে উঠল–পরমুহূর্তে সাত-আটজন যোদ্ধার দেহ মাটির ওপর পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

এরা নিশ্চয়ই বন্দুকের নামও কখনও শোনেনি। কারণ ব্যাপারটা দেখে তারা সবাই বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে অল্পক্ষণ সেখানে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, এবং তারপরেই মহাভয়ে তিরবেগে পলায়ন করতে লাগল। তারপর কেবল তারা নয়, সেখানকার সেই বিপুল জনতাও যেন কোনও যাদুমন্ত্রের মহিমায় কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

মালবিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, দাদা, ওই কেলে ভূতগুলো আমাকে ধরতে এসেছিল কেন?

মালবিকাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে শোভন বললে, কী করে জানব বল? ওদের ভাষা তো বুঝি না!

কাপ্তেন হত ও আহত যোদ্ধাগুলোর দেহের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আর দ্বীপ দেখে কাজ নেই যথেষ্ট হয়েছে। শিগগির জাহাজে চলো, হতভাগার যদি আবার দল বেঁধে আক্রমণ করে, তাহলে মুশকিলে পড়তে হবে।

.

চার । বিপদ

ইঞ্জিন মেরামত করবার জন্যে জাহাজখানা সেদিন সেইখানেই থেকে গেল।

সন্ধ্যার সময়ে জাহাজের ডেকে বসে কাপ্তেন ডেনহাম, শোভন, মালবিকা ও আরও কয়েকজন আরোহী আজকের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিল।

ডেনহাম বললে, ওরা কং কং করে অত চেঁচাচ্ছিল কেন? শোভন বললে, হয়তো কং ওখানকার কোনও দেবতার নাম।

ডেনহাম বললে, উঁচু মাচার ওপরে সেই মেয়েটির কথা মনে করো। আমি বেশ দেখেছি, তার মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাসে, আর পুরুতরা যখন মন্ত্র পড়ছিল, সে তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল!–আর গরিলাবেশে সেই লোকগুলোর কথাও মনে করো। নাচতে নাচতে হাত বাড়িয়ে তারা যেন সেই মেয়েটাকেই পেতে চাইছিল!

মালবিকা বললে, মিঃ ডেনহাম! আমার কিন্তু সেই মেয়েটিকে দেখে বলির পশুর কথাই মনে হচ্ছিল।

শোভন বললে, আর সেই অদ্ভুত প্রাচীর। আমি দেখেছি, প্রাচীরের সেই প্রকাণ্ড ফটকটা এদিক থেকেই বন্ধ করা আছে। তার মানে, ফটকের ওদিকে এমন কোনও আতঙ্ক আছে, যাকে ওরা এদিকে ঢুকতে দিতে রাজি নয়। সে আতঙ্ক এমন ভয়ংকর যে, দেড়শো ফুট উঁচু প্রাচীর তুলতে হয়েছে। ওখানকার বাসিন্দারা সবাই প্রাচীরের এদিকে থাকে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, প্রাচীরের এদিকটাকেই ওরা নিরাপদ ঠাঁই বলে মনে করে।

কাপ্তেন ঈঙ্গলহর্ন এতক্ষণ দুই চক্ষু মুদে পাইপ টানতে টানতে সমস্ত কথাবার্তা শুনছিলেন। এখন তিনি চোখ খুলে পাইপটা হাতে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, তবে আপনাদের আমি বিশ্বাস করতেও বলি না, কারণ অনেকদিন আগে আমি এমন একটা গল্প শুনেছিলুম, যা বিশ্বাস করবার মতো নয়। গল্পটা শুনেছিলুম আমি এক বুড়ো নাবিকের মুখে। তাদেরও জাহাজ নাকি চিন-সমুদ্রে টাইফুন-এ পথ হারিয়ে এক অজানা দ্বীপে গিয়ে পড়েছিল। সে দ্বীপের বাসিন্দারা অসভ্য। তাদের রাজা

নাকি এক দানবের মতো প্রকাণ্ড গরিলা। সে গরিলা এমন প্রকাণ্ড যে, কুকুর নিয়ে আমরা যেমন খেলা করি, বড় বড় হাতি নিয়ে তেমনি অবহেলায় সে খেলা করতে পারে। দ্বীপের বাসিন্দারা নাকি প্রতি বৎসর তাদের গরিলা-রাজাকে একটি করে বালিকা উপহার দেয়– সেই বালিকাকে তারা রাজার বউ বলে।

শোভন বললে, শুনেছি, আদিমকালে যখন মানুষের জন্ম হয়নি, তখন পৃথিবীতে সত্তর আশি ফুট উঁচু অতিকায় সব জীবজন্তু ছিল। পণ্ডিতরা মাটির ভিতর থেকে তাদের অনেক কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু সেসব জন্তু এখন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং হাতি নিয়ে ছোট কুকুরের মতন খেলা করতে পারে, এমন প্রকাণ্ড গরিলার কথা বিশ্বাস করি কেমন করে?

কাপ্তেন আবার তার দুই চক্ষু মুদে ফেলে বললেন, আপনাকেও বিশ্বাস করতে বলি না, আমি নিজেও বিশ্বাস করি না! আমি একটা গল্প শুনেছিলুম, আজ কেবল সেইটেই আপনাদের কাছে বললুম।

ডেনহাম বলল, ও দানব-গরিলাটার কথাটা নিশ্চয় আজগুবি কথা। কিন্তু পৃথিবীর কোনও-কোনও জায়গায় এখনও যে আদিম কালের অতিকায় জীবজন্তু জ্যান্ত অবস্থায় বিচরণ করছে, মাঝে মাঝে তাও শোনা যায়, আর অনেক পণ্ডিত সেকথা বিশ্বাস করেন।

শোভন বললে, আমারও কিন্তু ওইরকম অতিকায় জন্তুদের স্বচক্ষে দেখতে সাধ হয়।

মালবিকা বললে, আমারও।

হঠাৎ দুই চোখ খুলে ধড়মড় করে উঠে বসে কাপ্তেন বললেন, ডেনহাম! শুনছ?

কী?

হতভাগা বনমানুষগুলো আবার ঢাক-ঢোল বাজাতে শুরু করেছে।

হুঁ। দেখ-দেখ; কাল দ্বীপ ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার, আজ কিন্তু ওখানে শত শত মশাল জ্বলছে। ব্যাপার কী, অত আলো জ্বেলে ওরা কী করছে?

কৌতুক-হাস্য করে মালবিকা বললে, বোধহয় গরিলা-রাজার বউকে সাজানো হচ্ছে।

শোভন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, মালবিকা, বাইরের ঠান্ডা হাওয়ায় আর থেকো না, চলো, ভেতরে চলো।

.

পরের দিন সকালে কাপ্তেন ঈঙ্গলহন জাহাজের ডেকে পায়চারি করছেন, এমন সময়ে শোভন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, মি. ঈঙ্গলহর্ন। আমার ভগ্নীকে আপনি দেখেছেন? তাকে কেবিনের ভেতরে পাওয়া যাচ্ছে না!

কাপ্তেন বললেন, মিস্ সেন এদিকে তো আসেননি! বোধহয় জাহাজের অন্য কোথাও আছেন।

শোভন আকুল স্বরে বললে, আমি সমস্ত জাহাজ খুঁজে দেখেছি–আমার বোন কোথাও নেই।

কাপ্তেন হঠাৎ চকিত দৃষ্টিতে শোভনের হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, মি. সেন। আপনার হাতে ওটা কী?

শোভন বললে, আমার বোন যে কেবিনে ছিল, তারই দরজার কাছে আমি এই বর্শার ফলাটা কুড়িয়ে পেয়েছি।

বর্শার ফলাটা হাতে করে কাপ্তেন বললেন, দ্বীপের যোদ্ধাদেরও বর্শার ফলা এইরকম। মি. সেন, চলুন–চলুন, জাহাজটা আমরা-আর একবার খুঁজে আসি। মিস্ সেনকে পাওয়া যাচ্ছে না–তাও কি হতে পারে?

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মালবিকার সন্ধান মিলল না।

কাপ্তেন ঈঙ্গলহর্ন হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, কী! আমার জাহাজ থেকে মহিলা চুরি! এর পরে সভ্য সমাজে আমি মুখ দেখাব কেমন করে? ডেনহাম-ডেনহাম। বোট নামাও, এখনি আমরা দ্বীপে যাব। সবাই অস্ত্র ধরো! বন্দুক, রিভলভার, বোমা, ডিনামাইট সব নিয়ে চলো। চিন-সমুদ্রের চিনে-বোম্বেটেদের ভয়ে সবরকম অস্ত্রই আমি জাহাজে রেখেছি। সেসবই নিয়ে বোটে ওঠো-এক মুহূর্তও দেরি নয়। এই বনমানুষের দেশ আজ আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করে দিয়ে যাব।

.

পাঁচ। কং

রাতের নিবিড় অন্ধকারে অসভ্যদের ছিপ তিরের মতো দ্বীপের দিকে ছুটে চলল।

তখনও তারা তাকে সজোরে চেপে আছে, মালবিকা অনেক চেষ্টা করেও সে-সব কঠিন হাতের নিষ্ঠুর বাঁধন একটুও আলগা করতে পারলে না! তার মুখও বাঁধা, চিৎকার করাও অসম্ভব!

সে কি দুঃস্বপ্ন দেখছে? এও কি সম্ভব-সে কি সত্য সত্যই অসভ্যদের হাতে বন্দিনি? এত বড় বিপদ যে তার কল্পনাতেও আসে না!

হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে নৌকাখানা থেমে গেল-সঙ্গে-সঙ্গে যারা তাকে চেপে ধরেছিল, তারা হাতের বাঁধন খুলে দিলে।

কিন্তু তারপরেই অন্ধকারে কে তাকে পিঠের ওপরে তুলে নিলে। অনুভবে সে বুঝলে, তাকে নিয়ে লোকটা নৌকা থেকে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শব্দ শুনে সে বুঝতে পারলে, তার আশেপাশে অনেক লোক আছে। এরা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ...আর সে ভাবতে পারলে না, তার মাথা ঘুরতে লাগল, সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

.

মালবিকার যখন জ্ঞান হল, তখন সে দেখলে, তার চারদিকে আলোয় আলো! সে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

এ যে সকালের সেই দৃশ্যটাই আবার তার চোখের সামনে জেগে উঠল। সেই দুই বেদির ওপরে রাজা আর পুরুত বসে আছে, চারদিকে সেই জনতা, গরিলা-বেশে নর্তকদের নৃত্য, মন্ত্রপাঠ, ঢাক-ঢোলের আওয়াজ! কেবল সকালে মশাল ছিল না, এখন শত শত মশাল জ্বলছে।

তার দিকে করুণ মমতা-ভরা চোখে তাকিয়ে একটি কালো মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, মালবিকা তাকেও চিনতে পারলে! এই মেয়েটি সকালে ফুলের মুকুট ফুলের গয়না পরে মাচার ওপরে বসে ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। এখন তার আর সে মুকুট ও গয়না নেই, এখন তার সাজগোজ এখানকার অন্য অন্য মেয়েদেরই মতো!

একটুপরেই তার কারণও বুঝতে পারলে। তাকে উঠে বসতে দেখেই জনকয় লোক এসে তার মাথায় ফুলের মুকুট, গলায় ও হাতে ফুলের গয়না পরিয়ে দিলে।

পুরুত চিৎকার করে উঠল—হেডো মেডো গেডো!

অমনি কয়েকজন লোক এসে মালবিকাকে ধরে শূন্যে তুলে সেই উঁচু মাচার ওপরে গিয়ে উঠল। তারপর তাকে মাচার ওপরে বসিয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল! মাচার সিঁড়ির ধাপে-ধাপে অন্যান্য পুরোহিতেরা দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে মন্ত্রপাঠ শুরু করে দিলে—গরিলাবেশে বারোজন লোক ঢাকের তালে-তালে তাণ্ডব নাচ নাচতে লাগল!...আজ সকালেও সে এইরকম দৃশ্য দেখে গিয়েছিল।

মালবিকার এখন আর কোনও ভয় হচ্ছে না–তার মন এখন দুঃখ-ভয়-ভাবনার বাইরে গিয়ে পড়েছে, মন্ত্রমুগ্ধ ও স্বরাচ্ছন্ন জীবের মতন মাচার ওপরে সে বসে রইল–সামনে মূর্তিমান যমকে দেখলেও বোধহয় এখন সে চমকে উঠবে না!

সেইখানে বসে বসে সে নির্বিকারভাবে দেখতে লাগল, খানিক তফাতে একদল লোক গিয়ে উচ্চ প্রাচীরের প্রকাণ্ড ফটকটা খুলে ফেললে সঙ্গে-সঙ্গে বড় বড় কসর ও ঝাঁঝরের আওয়াজে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠল–ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং।

কোনও পথ দিয়ে নিচেকার সমস্ত জনতা হইচই তুলে সেই দেড়শো ফুট উঁচু পাঁচিলের ওপরে গিয়ে উঠল–প্রত্যেকের হাতে এক-একটা মশাল–চারিদিকের দৃশ্য দিনের বেলার মতো স্পষ্ট।

রাজা হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন–কং! কং! কং! টাস্কো!

অমনি কয়েকজন যোদ্ধা এসে আবার মালবিকাকে মাচা থেকে তুলে নামিয়ে নিয়ে গেল এবং তারপর সেই প্রকাণ্ড ফটকের ভিতরে প্রবেশ করল।

ফটকের ভিতর ঢুকলে প্রথমেই নজরে পড়ে ছোটখাটো একটা প্রান্তর,তারপরেই যেদিকে তাকানো যায়–নিবিড় অরণ্য ও ভয়াবহ অন্ধকার এবং তারই ভিতর থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে সেই মড়ার মাথার খুলির মতো অদ্ভুত পাহাড়ের চূড়াটা।

প্রাচীরের ওপর থেকে বিপুল জনতা সমস্বরে মন্ত্রপাঠ করছে!–ঢাক বাজছে দুম দুম দুম দুম,কাঁসর-ঝাঁঝর গর্জন করছে ঘং ঘং ঘং ঘং!

প্রান্তরের ওপরেও একটা উঁচু পাথরের বেদিতার দু-ধারে বড় বড় থাম। যোদ্ধারা মালবিকাকে নিয়ে সেই বেদির ওপর গিয়ে উঠল এবং দুই থামের মাঝখানে তাকে দাঁড় করিয়ে থামের সঙ্গে তার দুই হাত বেঁধে দিলে। তারপর ভূতের ভয়ে লোকে যেমন করে

পালায়, তেমনিভাবে সবাই আবার প্রাচীরের ওপারে পলায়ন করলে এবং সেইসঙ্গে সেই সুবৃহৎ ফটকটাও তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল।

পাহাড় ও অরণ্যের ভিতর থেকে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অপার্থিব মেঘ গর্জনের মতন গম্ভীর আওয়াজ জেগে উঠল!

প্রাচীরের ওপরে হাজার হাজার মশাল নাচিয়ে হাজার হাজার কণ্ঠে চিৎকার উঠল- কিং! কং! কং! কং! কং! কং!

মালবিকার প্রায়-মূর্ছিত দেহ তখন এলিয়ে পড়েছে নির্বাকভাবে, বিস্ফারিত নেত্রে সে দেখলে, জঙ্গলের গর্ভ থেকে অন্ধকারের চেয়ে কালো একটা ভয়ংকর ছায়া-দানব দুলতে-দুলতে এগিয়ে আসছে! কী বৃহৎ তার দেহ! যেন একটা চলন্ত পর্বত!

দানবটা পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে প্রাচীরের উপরের জনতার দিকে চেয়ে কয়েকবার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দান করলে! তারপর নিচু ও হেঁট হয়ে বেদির দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

তার চোখ দুটো ফুটবলের মতন বড় এবং তাদের ভিতর থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। তার এক-একটা দাঁত হাতির দাঁতের মতন লম্বা। তার এক-একখানা বাহু বটগাছের গুঁড়ির মতন মোটা। সেই বিভীষণ মূর্তি দেখে মালবিকা আর পারলে না–পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেল।

এই তাহলে কং-রাজা কং! এখানকার সমস্ত লোক এই বিরাট গরিলা-রাজার প্রজা! মালবিকা হবে আজ এই গরিলা-দানবের মানুষ- বউ!

কং যেন মালবিকাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল। বৎসরে-বৎসরে সে অনেক বন্ধু উপহার পেয়েছে, কিন্তু তাদের গায়ের রং তো এই নতুন বউয়ের মতন ধবধবে সাদা নয়!

কং হাত বাড়িয়ে পট পট করে দড়ি ছিঁড়ে মালবিকাকে তুলে নিলে। মানুষের হাতে চড়ুই-পাখিকে যেমন দেখায়, কঙের হাতের মুঠোর ভিতরে মালবিকাকেও দেখাতে লাগল তেমনি ছোট্টটি।

হাতের মুঠোর মালবিকাকে নিয়ে কং আবার পর্বত ও অরণ্যের দিকে অগ্রসর হল– তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

এমন সময়ে প্রাচীরের ওপার থেকে গুড়ুম গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ ও বহু কণ্ঠের আর্তনাদ জেগে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবৃহৎ ফটক আবার খুলে গেল।

কং কিন্তু একবারও পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে না, মস্ত এক লাফ মেরে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল!

.

সুবৃহৎ ফটকের ভিতর দিয়ে তিরের মতন বেগে প্রথমে শোভন, তারপর কাপ্তেন সাহেব, ডেনহাম ও নাবিকেরা সেই প্রান্তরের ওপরে এসে দাঁড়াল।

তাদের বন্দুকের গুলি খেয়ে প্রাচীরের ওপর থেকে ততক্ষণে মশালধারী অসভ্যগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

শোভন সর্বপ্রথমে এসেছিল বলে কেবল সেই-ই কঙের বিরাট দেহটা দেখতে পেয়েছিল– মাত্র এক পলকের জন্যে।

শোভন চেঁচিয়ে বলে উঠল, দানবটা ওই পথে গেছে। আমি তাকে দেখেছি। এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করলে আমার বোনকে আর পাওয়া যাবে না। তোমরা কে কে আমার সঙ্গে যাবে, এসো।

কাপ্তেন বললেন, এক মিনিট অপেক্ষা করুন মি. সেন...ডেনহাম, তুমি বিশ জন লোক নিয়ে মি. সেনের সঙ্গে যাও। বাকি লোকদের নিয়ে জাহাজ আর অসভ্যদের ওপরে পাহারা দেবার জন্যে আমি এখানে থাকি। সকলে এইটুকু মনে রেখো মিস্ সেনকে উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য–তাঁকে উদ্ধার করা চাই- ই।

সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ, তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য আমরা প্রাণ দিতেও ভয় পাব না।

কাপ্তেন বললেন, ভগবান তোমাদের সহায় হোন।

শোভন, ডেনহাম ও বিশজন নাবিক সেই দুর্গম অরণ্য ও দুরারোহ পর্বতের দিকে ঝড়ের মতো ছুটে চলল!

পাহাড়ের যেখান থেকে সেই দানব গরিলার মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেইখানে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল, পাহাড়ের গা সেখানে ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে–যেন জঙ্গলময় পাতালের অন্ধকারের মধ্যে।

ডেনহাম বললে, সকলে একসার হয়ে চলো–একজনের পিছনে আর-একজন। প্রত্যেকে তার আগের লোকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হও!

একে পাহাড়ের ঢালু গা, তার ওপরে জঙ্গল ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে।

ডেনহাম বললে, মি. সেন, জাহাজে চাকরি নিয়ে আমি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছি, সব দেশের গাছপালাই আমি চিনি। কিন্তু এখানকার জঙ্গলের একটা গাছও আমি চিনতে পারছি না। এসব গাছপালা দেখলে মনে হয়, এরা যেন এ পৃথিবীর নয়!

শোভন বললে, কেতাবে আমি সেকেলে পৃথিবীর গাছপালার ছবি দেখেছি। এখানকার গাছপালা দেখে সেই ছবির কথা আমার স্মরণ হচ্ছে। এখানকার সঙ্গে বোধহয় আধুনিক

জগতের কোনও সম্পর্ক নেই হয়তো এখানকার জীবজন্তুরাও সেকেলে জীবজন্তুদের মতন ভয়ংকর আর কিম্ভুতকিমাকার!

আপনি তো বলছেন, সেই গরিলা-দানবটাকে আপনি দেখতে পেয়েছেন। মাথায় সে কত উঁচু হবে?

শোভন বললে, আমি অনেক দূর থেকে চকিতের মতো তাকে একবার মাত্র দেখেছি। ঠিক করে কিছু বলতে পারব না, তবে আমার মনে হল, মাটি থেকে তার মাথা বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না।

ডেনহাম চমকে উঠে বললে, কী সর্বনাশ! বলেন কী?

পাহাড়ের ঢালু গা একটা উপত্যকার ভিতরে এসে শেষ হয়েছে। উপত্যকার ভিতর দিয়ে। একটা পাহাড়ে নদী কলকল স্বরে বয়ে যাচ্ছে এবং নদীর ওপারে পাহাড়ের গা আবার ওপর। দিকে উঠে গিয়েছে। আরও একটা লক্ষ করবার বিষয় হচ্ছে, নদীর ওপারে যে জঙ্গল রয়েছে তা আরও ঘন এবং দুর্ভেদ্য। সেখানকার এক-একটা গাছই একশো-দেড়শো ফুট বা তার চেয়েও বেশি উঁচু! সেইসব গাছের ওপরে কতরকমের পরগাছা ভিড় করে আছে এবং অসংখ্য লতাপাতার জালে প্রত্যেক গাছের সঙ্গে প্রত্যেক গাছ বাঁধা। এখন আকাশে সূর্যালোকের জোয়ার বইছে, কিন্তু সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কোনওকালেই বোধহয় সূর্যালোক প্রবেশ করবার পথ পায়নি!

শোভন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, দেখুন মি. ডেনহাম! নদীর তীরে ভিজে মাটির দিকে চেয়ে দেখুন।

ডেনহাম ও নাবিকরা আশ্চর্য হয়ে দেখলে, ভিজে মাটির ওপরে সারি সারি পায়ের দাগ রয়েছে। সেসব পায়ের দাগ মানুষের পায়ের দাগের মতন দেখতে বটে, কিন্তু মানুষের পায়ের দাগের চেয়ে তা অনেক অনেক গুণ বড়, কারণ তার প্রত্যেকটি পদচিহ্ন পাঁচ-ছয় ফুটের চেয়ে কম লম্বা হবে না!

শোভন বললে, এতক্ষণে সবাই বুঝতে পারলেন তো, আমরা কী ভীষণ দানবের পিছু নিয়েছি। সেই দানব এইখান দিয়ে নদী পার হয়ে গেছে। নদীটা ছোট, জলও বোধহয় বেশি নেই,–আসুন, আমরাও পার হয়ে যাই।

বাস্তবিক, নদীতে এক কোমরের বেশি জল হল না,সকলেই একে একে নিরাপদে পার হয়ে গেল।

ওপারে গিয়ে পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল, সেই দানবটা পাহাড়ের গা বয়ে আর ওপরে উঠেনি, ডানদিকে ফিরে নদীর ধার ধরেই চলে গেছে। সকলে সেই পথেই অগ্রসর হল। কিন্তু খানিক দূর গিয়ে পায়ের দাগও আর পাওয়া গেল না!

ডেনহাম বললে, এই যে, জঙ্গল সরিয়ে এখান দিয়ে মস্ত বড় কোনও জানোয়ার ভিতরে ঢুকেছে। এই পথেই এসো।

আরও খানিকটা এগিয়েই ডেনহাম থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শোভন বললে, ব্যাপার কী?

ডেনহাম বললে, সামনের দিকে চেয়ে দেখুন!

জঙ্গলের ভিতরে ছোট্ট একটা জমি। সেখানে এক ভীষণাকার জীব বিচরণ করছে! তার দেহটা চার-চারটে হাতির চেয়ে বড়, ল্যাজটা কুমিরের মতন দেখতে কিন্তু লম্বায় তা চব্বিশ-পঁচিশ ফুট হবে এবং তার ওপরে শত শত তীক্ষ্ণ গজাল! তার গলদেশও দীর্ঘায় চব্বিশ-পঁচিশ ফুটের চেয়ে কম হবে না এবং মুখটা দেখতে অজগর সাপের মতো। এই হস্তি কুমির-অজগর আকৃতির কিম্ভুতকিমাকার অতিকায় দানবটা আপন মনে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এবং তার পদভরে পৃথিবীর বুক থরথর করে কেঁপে উঠছে।

হঠাৎ সে-ও শোভনদের দূর থেকে দেখে ফেললে এবং সঙ্গে-সঙ্গে এমন বিকট ও কর্কশ স্বরে গর্জন করে উঠল যে, আকাশ বাতাস পর্যন্ত যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ডেনহাম চেঁচিয়ে বললে, সবাই সাবধান! ও আমাদের দেখতে পেয়েছে! ও আমাদের দিকে আসছে!

ডেনহাম ও শোভন একসঙ্গে বন্দুক ছুড়লে, গুলি তার গায়েও লাগল, কিন্তু তার অত বড় দেহের ভিতরে দুটো খুদে-খুদে গুলি ঢুকে কিছুই করতে পারল না, সে এক-এক লম্বা লাফ মেরে তেমনি বিকট স্বরে চাঁচাতে-চাঁচাতে শোভনদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ডেনহাম আবার গলা তুলে বললে, সবাই মাটির ওপর শুয়ে পড়ো! আমি বোমা ছুড়ছি!

বোমা ফাটবার সময়ে কাছে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তারও আহত হওয়ার সম্ভাবনা। সবাই শুয়ে পড়ল-সেই হিংস্র দানবটার দিকে সজোরে বোমা ছুঁড়ে ডেনহামও ধরণীতলকে আশ্রয় করলে!

গড়াম করে কান-ফাটানো শব্দের সঙ্গে বোমা ফেটে গেল–চারিদিকে ধুলো-ধোঁয়া কাঠ পাথর মাংস ও হাড়ের টুকরো ঠিকরে পড়তে লাগল এবং সকলেই শুনতে পেলে বিরাট এক দেহ মাটির ওপরে এক প্রচণ্ড আছাড় খেলে।

সকলে আবার উঠে দাঁড়াল। প্রায় ডেনহামের পায়ের কাছে এসে সেই জীবটার অজগরের মতন ভয়ানক মুখটা ছটফট করছে এবং তার দেহটা স্থির ও উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মতো!

আরও গোটাকয়েক গুলিবৃষ্টি করবার পর তার শেষ প্রাণটুকুও বেরিয়ে গেল।

শোভন বললে, কী ভয়ানক! বোমা ছোড়বার পরেও এই জীবটা অন্তত পঞ্চাশ ফুট জমি পার হয়ে এসেছে।

ডেনহাম আনন্দ ও গর্বের স্বরে বললে, কিন্তু এই রাক্ষসকে আমি কাত করেছি। একি যে-সে বোমা!

শোভন বললে, আমি যা ভেবেছিলুম, তাই। যে-কোনও কারণেই হোক, এই দ্বীপে সেকেলে পৃথিবীর রাক্ষুসে জীবগুলো এখনও বেঁচে আছে!..কিন্তু এখন আমাদের এ সব কথা ভাববার সময় নেই। এবার কোনদিকে যাব?

একজন নাবিক আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, এই তো আমাদের পথ। দেখছেন না, জঙ্গল ভেঙে এখান দিয়ে যেন একটা পাগলা হাতি চলে গিয়েছে!

নাবিক ঠিকই বলেছে। সকলে আবার সেই পথে পা চালিয়ে দিলে। বেশিদূর যেতে হল না! আবার সুমুখে এক মস্ত বাধা!

জঙ্গলের একপাশে নদীর জল প্রায় একটা হ্রদের মতো জলাশয় সৃষ্টি করেছে। গরিলা দানবের পায়ের দাগ সেই জলের ভিতরে নেমে গিয়েছে; দেখলে বুঝতে দেরি লাগে না যে, সে হ্রদ পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছে।

হ্রদের গভীরতা পরীক্ষা করে সকলেই বুঝলে এবারে আর পায়ে হেঁটে ওপারে যাওয়া চলবে না। এখন উপায়?

ডেনহাম দমবার পাত্র নয়। সে বললে, এসো, সবাই মিলে গাছ কেটে ভেলা তৈরি করি। আমরা ভেলায় চড়ে হ্রদ পার হব।

তা ছাড়া উপায়ও ছিল না। সবাই গাছ কাটতে আরম্ভ করলে।

শোভন বললে, আমার ভগ্নীর উদ্ধারের জন্যে আমাকে যদি পৃথিবীর এদিক থেকে ওদিকে যেতে হয়, যদি মরণের সম্মুখীনও হতে হয়, তাতেও আমার ভাববার কিছু থাকবে না। এইমাত্র আমরা যে অদ্ভুত জীবের কবলে গিয়ে পড়েছিলুম, এই দ্বীপে হয়তো তার চেয়েও সব ভয়ংকর জীবজন্তু আছে। হয়তো তাদের আক্রমণে আমাদের অনেকেরই প্রাণ যাবে।

আমার ভগ্নীর জন্যে আপনারা নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করবেন কি না, এইবেলা সেই কথাটা ভেবে দেখুন। আমি নিশ্চয়ই মরণের দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে যাব, কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করলে এখনও ফিরে যেতে পারেন।

সকলে একস্বরে বলে উঠল, আমরা কাপুরুষ নই মরতে ভয় পাই না।

.

সাত। ডাইনসর

কতকগুলো মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে শক্ত লতার বাঁধনে তাদের একসঙ্গে বেঁধে ভেলা তৈরি করা হল। লম্বা-লম্বা গাছের ডালের সাহায্যে ভেলা চালাবারও ব্যবস্থা হল।

বাইশজন লোক সেই ভেলার পক্ষে গুরুভার হলেও ভেলা সে-ভার কোনওরকমে সহ্য করলে। তারপর ভেলাকে অন্য তীরের দিকে সাবধানে চালনা করা হল।

খানিক দূরে গিয়ে গাছের লম্বা ডাল যতটা পারা যায় জলে ডুবিয়েও থই পাওয়া গেল না।

ডেনহাম বললে, আচ্ছা, ডালগুলোকে দাঁড়ের মতো ব্যবহার করো। অবশ্য, আমরা আর ততটা তাড়াতাড়ি যেতে পারব না, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই।

ডালগুলোকে দাঁড়ের মতো ব্যবহার করাতে ভেলাটা টলমল করতে লাগল।

ডেনহাম বললে, ভাইসব, সাবধান! ভেলা উলটোলে আর রক্ষা নেই।

হঠাৎ সমস্ত ভেলাটা একপাশে কাত হয়ে পড়ল-যেন জলের ভিতরে কীসের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছে।

সেইসঙ্গেই একসঙ্গে যেন পঞ্চাশটা ষাঁড় ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল।

একজন নাবিক সভয়ে বললে, হে ভগবান! ও আবার কী?

জলের মধ্য থেকে ভেলার ঠিক পাশেই প্রকাণ্ড একখানা বীভৎস মুখ এবং বিরাট একটা দেহের কতক অংশ জেগে উঠল। সে মুখখানা এত বড় যে, এক গ্রাসে পাঁচ-ছয়জন মানুষকে গিলে ফেলতে পারে!

শোভন বলে উঠল, ডাইনসর! ডাইনসর! ছবিতে আমি এ মূর্তি দেখেছি।

ভীষণ আতঙ্কে সকলে এ ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল! ভেলা উলটে যায় আর কি!

হঠাৎ সেই ভয়াবহ ডাইনসর জলের ভিতরে আবার ডুব মারলে। নাবিকরা আস্বস্তির নিশ্বাস ফেললে; কিন্তু শোভন ও ডেনহাম দেখলে জলের ভিতর দিয়ে মস্ত একটা ছায়া ভেলার দিকে এগিয়ে আসছে।

ডেনহাম তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ভেলা সামলাও–ভেলা সামলাও! কিন্তু তার মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতে সেই ক্রুদ্ধ জীবটা ভেলার তলায় বিষম এক টু মারলে। পর মুহূর্তে ভেলাখানা টুকরো-টুকরো হয়ে শূন্যে ঠিকরে উঠে আবার জলের ভেতরে গিয়ে পড়ল।

শোভন, ডেনহাম ও অন্যান্য নাবিকরা পাগলের মতো ওপারের দিকে সাঁতরে চলল। ভাগ্যে তীর আর বেশি দূরে ছিল না, সবাই কোনওরকমে ডাঙায় গিয়েই উঠে পড়ল–কেবল একজন ছাড়া। ডাঙায় উঠে শোভন ও ডেনহাম তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দেখলে, ডাইনসরটা আবার জলের ওপর মাথা তুলছে এবং তার চোয়ালের একপাশ দিয়ে এক হতভাগ্যের পা দুটো বেরিয়ে তখনও ছটফট করছে।

ডেনহাম শিউরে বলে উঠল, বোমা। একটা বোমা দাও।

একজন নাবিক বললে, বোমা জলে তলিয়ে গেছে।

বন্দুক, বন্দুক, একটা বন্দুক!

তাও জলের ভেতরে।

মূর্খ! তোমার নিজের বন্দুকটাও রক্ষা করতে পারোনি?

আপনিও তো নিজের বন্দুকটা জলে ফেলে এসেছেন!

হ্যাঁ, হ্যাঁ–যাক গে, আর কিছু বলতে চাই না। কিন্তু চোখের সামনেও বেচারার প্রাণ গেল, আর আমরা কিছু করতে পারলুম না।

শোভন বললে, আর এখানে থাকলে এইবার আমাদেরও প্রাণ যাবে! ওই দেখ ডাইনসরটা ডাঙার দিকেই আসছে। জলে-স্থলে ওর অবাধ গতি।

সবাই আবার প্রাণপণে ছুটল–হ্রদের ধার ছেড়ে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, ঢালু পাহাড়ের গা বয়ে!

পিছনে আর কোনও শব্দ নেই শুনে সবাই আবার দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

কিন্তু ভগবান সেদিন তাদের কপালে বিশ্রাম লেখেননি। এক মিনিট জিরুতে না জিরুতে নীচের দিকে জঙ্গল ভাঙার শব্দ হল।

ডেনহাম আঁতকে উঠে বললে, আবার সেই ডাইনসর আসছে নাকি?

শোভন বললে, চুপ! নীচের ওইদিকটায় চেয়ে দেখো!

সেই গরিলা দানব-রাজা কং! তার ডানহাতের মুঠোয় তখনও মালবিকা অজ্ঞান হয়ে আছে।

কী বৃহৎ তার দেহ বড় বড় গাছের ওপরেও তার মাথা জেগে আছে। অতি যত্নে মালবিকাকে নিয়ে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে সে ওপরে উঠে আসছে এবং মাঝে মাঝে মালবিকার দেহের দিকে যেন সস্নেহেই তাকিয়ে আছে।

আচম্বিতে পাশের জঙ্গল ভেদ করে আরও দুটো বেয়াড়া, ভীষণদর্শন জানোয়ার কঙয়ের সামনে এসে পথ জুড়ে দাঁড়াল। দেখতে কতকটা গন্ডারের মতো, কিন্তু মাথায় তারা প্রায় হাতির সমান উঁচু এবং তাদের প্রত্যেকের মাথার ওপরে তিন-তিনটে করে ধারাল শৃঙ্গ।

ডেনহাম চুপিচুপি সভয়ে বললে, ও আবার কী সৃষ্টিছাড়া জীব?

শোভন বললে, ট্রাইশেরোটপ! ওরাও সেকেলে পৃথিবীর জীব।

ট্রাইশেরোটপদের দেখেই কং যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল! সে তখনি একটা উঁচু ঢিপির ওপরে মালবিকার দেহকে নিরাপদ করবার জন্যে তুলে রাখলে এবং তারপর প্রকাণ্ড একখানা পাথর তুলে গর্জে উঠে সজোরে একটা ট্রাইশেরোটপের দিকে নিক্ষেপ করলে। কঙয়ের হাতের জোরে ও পাথরের ভারে ট্রাইশেরোটপের একটা শৃঙ্গ তখনি ভেঙে গেল।

ডেনহাম সবিস্ময়ে বললে, ও দানবের দেহের শক্তি স্বচক্ষে দেখেও যে বিশ্বাস হচ্ছে না। ও পাথর ছুড়লে না, একটা পাহাড় তুলে ছুড়লে? অত বড় পাথর, কোনও জ্যান্ত জীব তুলতে পারে?

এদিকে সঙ্গীর দুর্দশা দেখে দ্বিতীয় ট্রাইশেরোটপটা ভয়ে পিছিয়ে আসতে লাগল। প্রথমটাও পালাই পালাই করছে, কিন্তু তার আগেই আর একখানা আরও বড়-প্রস্তর তুলে কং আবার তার দিকে সজোরে ছুড়ল সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল। বিজয়গৌরবে ফুলে উঠে কং সগর্বে দুই হাতে ঘন ঘন নিজের বুক চাপড়াতে লাগল।

শোভন বললে, আর এখানে নয়। ওই দেখুন, দ্বিতীয় ট্রাইশেরোটপটা এদিকেই ছুটে আসছে। ওর আগেই আমাদের পালাতে হবে।

সকলে দ্রুতপদে পলায়ন করলে! কিন্তু ট্রাইশেরোটপটা তাদের চেয়েও বেশি তাড়াতাড়ি ছুটে আসছিল–সে তাদের দেখতে পেলে এবং এরা আর একদল নতুন শত্রু ভেবে ভীষণ আক্রোশে তাদের আক্রমণ করলে।

সকলের পিছনে ছিল যে বেচারা, সে ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা গাছের ওপরে চড়তে লাগল। কিন্তু ট্রাইশেরোটপের মাথার এক আঘাতে গাছটা মড় মড় করে ভেঙে পড়ল।

তার পরেই বুকফাটা এক আর্তনাদ এবং তারপরেই ট্রাইশেরোটপের নিষ্ঠুর শৃঙ্গ আর একজন অসহায় মানুষের কণ্ঠ চিরকালের জন্যে নীরব করে দিলে।

.

আট । মানুষ পোকা

সকলে একান্ত শ্রান্তভাবে টলতে টলতে একটা বড় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে পড়ল।

মানুষের শরীরে আর কত সয়? সাহস ও বীরত্বেরও একটা সীমা আছে। এই খানিক আগেই যারা বলেছিল, আমরা মরতে ভয় পাই না এখন তারাই আর সে কথা বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। ভেলা ডোবার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের সমস্ত আশা ফুরিয়ে গিয়েছে। তারা এতক্ষণে বুঝলে, যেখানে পদে পদে এমন সব মারাত্মক বিপদ, সেখানে নিরস্ত্র ক্ষুদ্র মানুষ কোনও কাজই করতে পারবে না।

তখনও হাল ছাড়েনি খালি শোভন ও ডেনহাম।

ডেনহাম বললে, মি. সেন, আমার এক প্রস্তাব আছে। আমার বিশ্বাস, খালি হাতে ওই দানবের কাছ থেকে মিস্ সেনকে আমরা কখনওই উদ্ধার করতে পারব না। তার চেয়ে আর এক কাজ করলে কেমন হয়?

কী কাজ?

আমাদের একজন এখানে থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে ওই গরিলা-দানবের গতিবিধির ওপরে দৃষ্টি রাখুক। দলের বাকি লোকেরা কোনওরকমে ফিরে গিয়ে আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসুক।

এ পরামর্শ মন্দ নয়। আপনারা ফিরে যান, আমি এখানে থেকে ওই দানবের ওপরে পাহারা দি।

কিন্তু ওই দেখুন মি. সেন, দানবটা আবার এই দিকেই আসছে। ও কি আমাদের দেখতে পেয়েছে?

মালবিকার অচেতন দেহ সেইভাবে করতলে নিয়ে কং আবার এই দিকেই আসছে বটে! কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হয় না, সে সন্দেহজনক কিছু দেখেছে। কারণ, সে বেশ নিশ্চিন্তভাবেই পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে।

খানিকটা এগিয়ে এসেই সে আবার থেমে দাঁড়াল। একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চারিদিকে দেখে নিলে। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে একদিকে নামতে লাগল।

অত্যন্ত সন্তর্পণে সবাই ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, অল্প নীচেই আর একটা পাহাড়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত রয়েছে সুদীর্ঘ একটা গাছের গুঁড়ি। হয়তো কবে কোনও ঝড়ে পড়ে গিয়ে গাছটা এই স্বাভাবিক সেতুর সৃষ্টি করেছে।

কং সেই সেতু পার হয়ে ওপারের জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শোভন বললে, আমিও সেতু পার হয়ে ওর পিছনে পিছনে চললুম। আপনারা ফিরে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসুন। আমি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব! এই বলে সেও পাহাড়ের গা বেয়ে সেতুর দিকে নামতে লাগল।

নামতে নামতে সে দেখলে, সেতুর প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে, নদীর তীরে-তীরে শত শত অজানা ও ভয়ানক জীব বিচরণ করছে। কোনওটা মাকড়সার মতো দেখতে, কিন্তু আকারের বড়-জাতের কচ্ছপকেও হার মানায়। কোনও কোনও জীব অনেকগুলো শুড়

নেড়ে বেড়াচ্ছে, অক্টোপাসের মতো। কোনও কোনওটা গিরগিটির মতো কিন্তু কুমিরের মতো মস্ত গিরগিটি। তারা সবাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। শোভন শিউরে উঠে ভাবলে, নরকও বোধ করি এই দ্বীপের চেয়ে ভয়ানক নয়।

এদিকে ডেনহামও তার দলবল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্ত্র হাতে নিয়েও মানুষ এখানে নিরাপদ নয়, এখন আবার সকলকে নিরস্ত্র অবস্থায় এই সুদীর্ঘ পথ পার হতে হবে। হয়তো ফেরবার পথে আরও কত লোকের প্রাণ নষ্ট হবে। সেই বিষম হ্রদ! তার জলের তলা দিয়ে ক্ষুধার্ত সব কালো ছায়া আনাগোনা করে মানুষ সেখানে অসহায় কীট মাত্র, তার জীবনের কোনও মূল্যই নেই।

সকলে অত্যন্ত নাচারের মতো অগ্রসর হতে লাগল সকলেই বোবা ও বিমর্ষ, জাহাজে ফিরে যাবার জন্যেও কারুর মনে কিছুমাত্র উৎসাহ নেই।

কিন্তু সর্বনাশ! সেই শয়তান ট্রাইশেরোটপ তখনও যে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রাগে ঘোঁত ঘোঁত করছে। সামনে এতগুলো মানুষকে দেখেই প্রবল পরাক্রমে সে আবার তিনটে শিং নেড়ে তেড়ে এল।

ডেনহাম বললে, নদীর ধারে নদীর ধারে চলো সাঁকোর মতো সেই গাছের ওপরে।

সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই পাহাড়ে নদীর তীরে সাঁকোর সামনে এসে দাঁড়াল।

শোভন ততক্ষণে ওপারে গিয়ে হাজির হয়েছে। পিছনে গোলমাল শুনে ফিরে দাঁড়িয়েই দেখলে, তার সঙ্গীরাও সাঁকোর ওপরে ছুটে আসছে এবং তাদের পিছনে-পিছনে আসছে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো সেই ট্রাইশেরোটপ। ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরি লাগল না।

এদিকে ওপর থেকে কার এক বিপুল ছায়া তার গায়ের ওপর এসে পড়ল।

মাথা তুলতেই নজরে পড়ল, কঙের প্রকাণ্ড মুখ পাহাড়ের পাশ থেকে উঁকি মারছে। পর-মুহূর্তেই কঙের মুখ আবার অদৃশ্য হয়ে গেল–শোভন বুঝলে, কং তাদের আক্রমণ করতে আসছে।

সে চিৎকার করে বললে, পালাও–পালাও-মাথার ওপরে সাক্ষাৎ যম!

দেখা গেল, আবার পাহাড়ের গা বেয়ে কং লাফাতে-লাফাতে নেমে আসছে।

শোভন হেঁট হয়ে দেখলে, নদীর ধার থেকে পাহাড়ের যে-অংশটা খাড়া ওপরে উঠেছে, তার ভিতরে মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট গুহার মতন রয়েছে অনেকগুলো গর্ত। পাহাড়ের ওপর থেকে অগুন্তি আঙুরলতা সেই সব গর্তের মুখ পর্যন্ত ঝুলে পড়ছে! আঙুরলতা যে কীরকম শক্ত, শোভনের সেটা অজানা ছিল না। সে চট করে একটা আঙুরলতা ধরে ঝুলে পড়ল এবং একটা গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

ডেনহামও তখন সাঁকো পেরিয়ে নদীর এপারে এসে পড়েছিল, শোভনের দেখাদেখি সেও আর একটা আঙুরলতাকে অবলম্বন করে আর-একটা গুহায় গিয়ে ঢুকল।

কং সাঁকোর মুখে এসে হাজির হল। যে নারকীয় দেশে সে বাস করে, সেখানকার মূলমন্ত্র হচ্ছে–হয় মারো, নয় মরো। হিংসাই সেখানকার ধর্ম! প্রত্যেক জীবই সেখানে অন্য জীবকে হিংসা করে। কাজেই জীবিত যা কিছু, কং তাকেই শত্রু বলে ভাবে–তা সে আকারে ছোটই হোক, আর বড়ই হোক।

এতগুলো মানুষ পোকাকে দেখে তাই কঙের আজ রাগের সীমা নেই! একটা বজ্রদগ্ধ চুড়োভাঙা গাছের গুঁড়ির ওপরে মালবিকার জ্ঞানহারা দেহকে সকলের নাগালের বাইরে রেখে, কং সশব্দে তার বুক চাপড়াতে লাগল–যেন সে সবাইকে যুদ্ধে আহ্বান করছে!

কঙের কাছে পোকার মতোই খুদে-খুদে সেই মানুষগুলো তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে কি, উভয় সঙ্কটে পড়ে তাদের অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছে। সাঁকোর এদিকে দাঁড়িয়ে কং করছে যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি আর সাঁকোর ওদিকে দাঁড়িয়ে তিন তিনটে। শিং উঁচিয়ে

তড়পাচ্ছে সেই বিশ্রী ট্রাইশেরোটপ! তুচ্ছ এক গাছের গুঁড়ির সাঁকো, তার ওপরে আঠারো জন অসহায় মানুষ–একবার পা ফসকালেই আর রক্ষা নেই।

কং গাছের গুঁড়িটা ধরে একবার একটা ঝকানি দিয়ে দেখলে। মানুষগুলো অমনি গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল শুনে কং নিজের ভাষায় কচর কচর করে কি যেন বলতে লাগল।

শোভন গুহা থেকে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললে, হুশিয়ার হুঁশিয়ার!

কং শোভনকে দেখে তার দিকেই দুপা এগিয়ে এল কিন্তু তার পরেই কী ভেবে আবার সাঁকোর মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

ডেনহাম নিজের গুহার ভিতর থেকে একখানা বড় পাথর দু-হাতে তুলে কংকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে। সে পাথরখানা কোনও মানুষের ওপরে গিয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটত; কিন্তু তার আঘাত কং গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সে দুই হাতে কাঠের গুঁড়ির একমুখ তুলে ধরে ক্রমাগত ডাইনে-বাঁয়ে নাড়া দিতে লাগল।

দুইজন হতভাগ্য লোক গাছের গুঁড়ি থেকে ফসকে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে নীচে পড়ে গেল। সেখানে নদীর জল ছিল না। প্রথম লোকটা নীচে পড়ে একটুও নড়ল না। কিন্তু সে পড়বামাত্রই কুমিরের মতো মস্ত একটা গিরগিটি এসে তার দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় লোকটা পড়ল নীচের দিকে পা করে–তার কোমর পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেল। হয়তো সে বেঁচে যেত, কিন্তু সে যখন কাদা থেকে ওঠবার চেষ্টা করছে, তখন কোথা থেকে দলে দলে প্রকাণ্ড কাছিমের মতো মাকড়সা এসে তাকে আক্রমণ করলে। সে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল এবং সেই মাকড়সাগুলো তার গা থেকে ডুমো ডুমো মাংস খুবলে খেতে লাগল।

কং আবার গুঁড়ি ধরে নাড়া দিলে, আবার কয়েকজন লোক নীচে গিয়ে পড়ল। আবার গুঁড়ি ধরে নাড়া, আবার মনুষ্য-বৃষ্টি।

আর একজন মাত্র মানুষ সাঁকোর ওপরে আছে। সে এমন প্রাণপণে গুঁড়িটা জড়িয়ে রইল যে, কং অনেক নাড়া দিয়েও তাকে স্থানচ্যুত করতে পারলে না। তখন সে একটানে গুঁড়িসুদ্ধ মানুষকে শূন্যে তুলে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করলে। নদীগর্ভ তখন হরেকরকম বীভৎস জানোয়ারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে; আসন্ন ভোজের সম্ভাবনায় তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়তে লাগল এবং আহত মানুষদের মর্মান্তিক আর্তনাদে আকাশ, বাতাস, পর্বত ও অরণ্য ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

নিজের গুহায় নিরুপায় হয়ে বসে মহা আতঙ্কে ও স্তম্ভিত নেত্রে শোভন এইসব হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে হয়তো মানুষের গন্ধ পেয়েই এক বিরাট মাকড়সা দ্রাক্ষালতা বেয়ে কখন যে ওপরে উঠতে শুরু করেছে, শোভন প্রথমটা তা টের পায়নি। যখন। দেখতে পেলে, মাকড়সাটা তখন প্রায় গুহার মুখে এসে পড়েছে, দুটো ক্ষুধার্ত ড্যাবডেবে ভীষণ চক্ষু শোভনের দিকে তাকিয়ে আছে। শোভন তাড়াতাড়ি ছোরাখানা বার করলে—এই ছোরাখানাই তখন তার একমাত্র সহায়। সে ছোরার আঘাতে দ্রাক্ষালতা কেটে দিলেলতাসুদ্ধ মাকড়সাটা নীচে পড়ে গেল।

ডেনহামের চিৎকার শোনা গেল—মি. সেন। মি. সেন।

আবার কী ব্যাপার, দেখবার জন্যে শোভন গুহার ভিতর থেকে মুখ বাড়ালে। একখানা লোমশ, কৃষ্ণবর্ণ গাছের গুঁড়ির মতন প্রকাণ্ড বাহু পাহাড়ের ওপর থেকে গুহার দিকে নেমে আসছে। পাহাড়ের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে কং তাকে ধরবার চেষ্টা করেছে। শোভন সাঁৎ করে গুহার ভিতরে সরে গেল। তারপর হাতখানা যেই গুহার মুখে এল, শোভন অমনি তার ওপরে বসিয়ে দিলে ছোরার এক ঘা। হাঁউ- মাউ করে চেঁচিয়ে কং তখনি হাত সরিয়ে নিলে! নিজের রক্তমাখা হাতের দিকে তাকিয়ে সে সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল—মানুষ পোকাগুলো তাহলে কামড়াতেও জানে! ওদিকের গুহা থেকে ডেনহাম একখানা বড় পাথর ছুড়লে—পাথরখানা সিধে এসে ঠক করে তার নাকের ডগায় লাগল। চোট খেয়ে কং আরও চটে গেল—অ্যাঃ, আমার নাকের ডগায় পাথর ছুঁড়ে মারা! রোস তো, মজাটা দেখাচ্ছি

তবে! বোধহয় এইরকম একটা কিছু ভেবেই কং আবার পাহাড়ের ধারে ঝুঁকে পড়ে গুহার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে শোভনকে খুঁজতে লাগল–ছেলেরা যেমন করে দেওয়ালের গর্তে হাত ঢুকিয়ে পাখির বাচ্চা খোঁজে। শোভন আড়ষ্ট হয়ে সেই গুহার পিছনের দেয়ালে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

.

নয়। কুমির-ক্যাঙারু

বাজপোড়া গাছের ওপরে এতক্ষণ পরে মালবিকার জ্ঞান ফিরে এল।

প্রথমটা কিছুই তার মনে পড়ল না। একবার এপাশ, আর একবার ওপাশ করে ব্যথা বোধ হল–আবার চিত হয়ে দেখলে, ওপরে রোদের সোনার জলে ধোয়া নীল আকাশ।

পিঠে কেন লাগে? কোথায় সে? ধড়মড় করে উঠে বসে দেখে, চারিদিকে পাহাড়, বন, নদী। এখানে সে কেমন করে এল?

আচম্বিতে তার মনের মধ্যে জেগে উঠল, অসভ্যদের ঢাক-ঢোলের আওয়াজ, গরিলারূপে নর্তকদের নাচ, হাজার-হাজার মশালের আলো, আকাশছোঁয়া পাঁচিলের প্রকাণ্ড ফটক, প্রান্তরের দুই থামওয়ালা পাথরের বেদি, সহস্র কণ্ঠের চিৎকার–এবং তারপর, সেই বিভীষণ গরিলা দানব–রাজা কং! তখন তার সকল কথা মনে পড়ল।

খানিক তফাতেই দেখলে, পাহাড়ের ধারে বসে কং নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে কী করছে। তাহলে এখনও সে তাকে ছাড়েনি। এই উঁচু গাছের গুঁড়ির ওপরে এখনও সে কঙের বন্দিনি?

আর একটা ভয়ানক ও কী জীব এদিকে আসছে? একি স্বপ্ন? একি সত্য? এমন জীব কি দুনিয়ায় থাকতে পারে? আকারে এ কঙেরই মতন বিরাট, কিন্তু এর চেহারা যে কঙেরও

চেয়ে ভয়ঙ্কর! মাথায় পাঁচ-ছয়তলা বাড়ির চেয়েও উঁচু, যেন একটা বিশালদেহ কুমির ক্যাঙারুর মতন পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে আসছে।

মূর্তিটা আরও কাছে এলে পর মালবিকা দেখলে, তার সামনেও দুটো পা আছে বটে, কিন্তু সে পা দুটো এত পলকা যে, মুখে খাবার তুলে খাওয়া ছাড়া তার দ্বারা বোধহয় আর কোনও কাজ করাই চলে না। কিন্তু তার মুখ! কী ভীষণ, কী বীভৎস সে মুখ, দেখলেই যেন আর জ্ঞান থাকে না।

মূর্তিটা ক্ষুধিতভাবে রক্তরাঙা চক্ষে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ মালবিকা তার নজরে পড়ে গেল। আর কোথায় যায়? পৃথিবী কাঁপানো এক হুঙ্কার দিয়ে মালবিকার দিকে সে মস্ত এক লাফ মারলে। মালবিকাও মহা ভয়ে আর্তনাদ করে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললে।

সেই হুঙ্কার আর এই আর্তনাদ কঙের কানে গেল বিদ্যুতের মতন ফিরেই সে সেই নরখাদক জীবটাকে দেখতে পেলে। গুহার ভিতরকার তুচ্ছ মানুষ-পোকার কথা ভুলে তখনি সে উঠে দাঁড়াল এবং বিষম আক্রোশে দুই হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঝড়ের মতন বেগে ধেয়ে এসে সেই ভয়াবহ দানবকে অকুতোভয়ে আক্রমণ করলে।

দানবটার গজালের মতন বড় বড় দাঁতে যেন আগুন খেলে গেল–মস্ত এক হাঁ করে সে কংকে কামড়ে দিতে এল–তারপরেই পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে দুই বিরাট দেহই প্রপাত ধরণীতলে হল। কং পড়ল তার উপরদিকে। প্রথমটা মনে হল, এই দানবটাকে কায়দায় আনতে কঙের বেশি সময় লাগবে না, কিন্তু ভুল। সেও বড় সামান্য রাক্ষসে জীব নয়। কং দুই হাতে গলা টিপে ধরেছিল বটে, কিন্তু তার পিছনের বিষম মোটা বলবান পা দুটো দিয়ে সে শত্রুর বুকে এমন প্রচণ্ড লাথি মারলে যে, অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হয়েও কং কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলে না–বেজায় একটা ডিগবাজি খেয়ে সে বহুদূরে ছিটকে নীচে নদীর গর্ভে পড়ে যায় আর কি।

অতি উৎকণ্ঠার সঙ্গে মালবিকা বলে উঠল–না, না, না!

মালবিকা চায়, কং জয়লাভ করুক। কং বড় কম ভয়ানক নয়, তার হাতে বন্দিনি হওয়াও মরণেরই সামিল, কিন্তু এই ভূতুড়ে দানবের মুখগহ্বরে যাওয়ার চেয়ে কঙের কবলগত হওয়া অনেক ভালো।

কং কোনওরকমে সে যাত্রা বেঁচে গিয়ে আবার উঠে দানবটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনের চিৎকারে পাহাড়ের পাথরও যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। দানব আবার তার সাংঘাতিক পা ছুড়লে কং আবার দূরে ছিটকে গিয়ে ভূতলশায়ী হল।

কং আবার উঠে দাঁড়াল। সে আর গর্জনও করলে না, বুকও চাপড়ালে না। বোধহয় সে বুঝলে, এরকম বলিষ্ঠ ও প্রচণ্ড শত্রুকে চেঁচিয়ে বা বুক চাপড়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করা মিথ্যা! এবারে সে খুব সাবধানে এগিয়ে এল এবং তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে একটা ফাঁক খোঁজবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সব শত্রু তার কাছে নতুন নয়। এদের কাবু করবার ফিকির সে জানে।

কং হঠাৎ এক লাফে দানবের সুমুখে এল এবং তার উপরকার একখানা পা ধরে একেবারে ভেঙে মুচড়ে দিলে! দানবটাও তার কাঁধ কামড়ে ধরলে কংও আবার তফাতে সরে গেল!

কং আবার এল–আবার এক লাফে দানবের গলা চেপে ধরলে আবার দুইজনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল–এবং দানবটা আবার তাকে লাথি মারলে।

কিন্তু এবারের লাথিতে আর আগেকার জোর ছিল না তাই লাথি খেয়ে মাটিতে পড়বার আগেই কং যা চাচ্ছিল সেই সুযোগটা পেলে,–সে দানবের পিছনের একখানা পা খপ করে ধরে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক মোচড় দিতেই দানবটা একেবারে হুড়মুড়িয়ে মাটির ওপরে লম্বা হয়ে পড়ল! চোখের পলক ফেলবার আগেই কং একেবারে তার পিঠে চড়ে বসল এবং নিজের দুই পায়ে তার কাঁধ চেপে ধরে দুই হাতে তার দুই চোয়াল বাগিয়ে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে দিলে এক বিষম হেঁচকা টান। কী হাতের জোর কঙয়ের! দানবের সেই বৃহৎ চোয়াল। চড়চড় করে চিরে গেল! সঙ্গে-সঙ্গে এক লাফে কং আবার দাঁড়িয়ে

উঠল! দানবটা মৃত্যুযন্ত্রণায় পাকসাট খেতে-খেতে যতই ছটফট করে, বিজয়-উল্লাসে অধীর হয়ে কং তত হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। তারপর দানবটার দেহ যখন একেবারে স্থির ও আড়ষ্ট হয়ে গেল, কং তখন খুব খুশি হয়ে কচরকচর করে নিজের ভাষায় কী বলতে-বলতে বারংবার মালবিকার পানে তাকাতে লাগল, যেন সে তার মুখে নিজের বীরত্বের জন্যে দু-চারটে বাহবা শুনতে চায়!

কিন্তু মালবিকার তখন কোনও শক্তিই ছিল না–বিপুল উত্তেজনায় আবার তার জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কং অত্যন্ত যত্ন ও মমতার সঙ্গে তার দেহকে তুলে নিলে।

এই বিশ্রী জানোয়ারটা নোংরা হাতে আবার তার ভগ্নীর দেহ স্পর্শ করছে দেখে, শোভন রাগে যেন খেপে গেল! সে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করলে। কিন্তু তারপরে এই ভেবে আত্মসংবরণ করলে যে, কংকে বাধা দেবার মিছে চেষ্টা করে যেচে নিজের মরণকে ডেকে এনে লাভ কী? তাতে তো মালবিকা মুক্তি পাবে না। তার পক্ষে এখন একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, লুকিয়ে কঙের পিছনে পিছনে থাকা। তাহলেই যথাসময়ে ডেনহাম লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে এলে মালবিকাকে উদ্ধার করা খুবই সহজ হবে।

ওদিকে কঙের ব্যবহার দেখে বেশ বোঝা গেল যে, গুহার ভিতরকার দুষ্ট-মানুষ-পোকার কথা তার আর কিছুই মনে নেই! সে পুতুলের মতন মালবিকাকে নিজের হাতের চেটোয় নিয়ে আবার পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শোভন ও ডেনহাম তখন নিশ্চিন্ত হয়ে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে দ্রাক্ষালতা বেয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠল।

শোভন বললে, পোল তো আর নেই! আপনি ওপারে যাবেন কেমন করে?

ডেনহাম বললে, যেমন করে হোক, নদী পার হবই। কিন্তু মি. সেন, এই নরকে আপনাকে একা ফেলে যেতে আমার মন সরছে না।

শোভন বললে, আমার সঙ্গে থেকেই বা আপনি কী করবেন? খালি হাতে আমরা দুজনে কিন্তু কঙের সঙ্গে লড়তে পারব না। বন্দুক চাই, বোমা চাই, লোকবল চাই। আপনি তাই আনতে যান। কঙের পিছনে কোনওদিকে আমি গেছি, পথে সে চিহ্ন রেখে যাব।

ডেনহাম বললে, হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বেশ, তাই হোক।

শোভন বললে, আর এখানে সময় নষ্ট করলে কংকে হয়তো শেষটা হারিয়ে ফেলব। বিদায় বন্ধু, বিদায়!

বিদায়! ভগবান আপনাকে সাহায্য করুন।

দূরে বনের ভিতরে মড় মড় করে গাছ-ভাঙার শব্দ হচ্ছে। কং তার পথ সাফ করতে করতে বাসায় ফিরে চলেছে। বাজপোড়া গাছের পাশে দানবটার বিশাল দেহ পড়ে রয়েছে। মরা জন্তুর মাংসের গন্ধ যে নীচে নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছেছে, সেই প্রমাণ দেবার জন্যে দলে দলে কাছিমের মতো বড় মাকড়সা ও কুমিরের মতো বড় গিরগিটি এবং আরও সব কত বিটকেল জন্তু দানবের সেই আড়ষ্ট দেহের দিকে এগিয়ে আসছে।

শোভন শিউরে উঠে কঙের সন্ধানে ছুটল।

.

দশ। জলচর অজগর

কং কোন দিকে গেছে, তা খোঁজবার জন্যে শোভনকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। কোথাও ধুলোর ওপরে প্রকাণ্ড পায়ের দাগ, কোথাও-বা গাছের ভাঙা ডাল পড়ে রয়েছে;–সেইসব চিহ্ন দেখে সে অনায়াসেই ঠিক পথে এগিয়ে চলল। সমস্ত শত্রু বধ করে কংও এখন নিশ্চিন্ত হয়েছিল, তাই এখন সে পরম আরামে ধীরে-ধীরে হেলতে-হেলতে দুলতে-দুলতে অগ্রসর হচ্ছিল, কাজেই শোভন শীঘ্রই তার নাগাল ধরে ফেললে। কিন্তু সে খুব সাবধানে লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলতে লাগল,–কেন না একবার করে চোখে পড়ে গেলে

তার যে কী দুর্দশাটাই হবে, সেটা সে ভালো করেই জানে! পথের ওপরে নানা আকারের আরও সব পায়ের দাগ দেখে এও সে বুঝতে পারলে যে, এখান দিয়ে কঙের মতো প্রকাণ্ড বহু রাক্ষুসে জীবই আনাগোনা করে থাকে, তারাও তাকে দেখতে পেলে জামাইআদর করবে না। এখানে পদে-পদে বিপদ, একটু অন্যমনস্ক হলেই প্রাণটা বাজে-খরচ হতে বিলম্ব হবে না!

মাঝে-মাঝে ভরসা করে দু-পা বেশি এগিয়ে সে উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছে মালবিকার অবস্থাটা। কিন্তু কঙের হাতের চেটোয় কী বরাবর ঠিক একভাবেই স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে–বোধহয় এখনও তার মূর্ছা ভাঙেনি।

জঙ্গল ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছে–ঝোপঝাপ, লতাপাতা আর বড় দেখা যায় না। খানিক তফাতে তফাতে বড় গাছগুলো কেবল দাঁড়িয়ে রয়েছে!

পাহাড়ের ঢালু গা ক্রমেই ওপরে উঠে গিয়েছে–শোভনের চোখের সুমুখে এখন স্পষ্ট জেগে উঠল মড়ার মাথার খুলির মতো সেই পাহাড়টার ন্যাড়া শিখর। কং সেই দিকেই যাচ্ছে।

শোভন বুঝলে, এই সব উঁচু শিখরের উপরেই কঙের বাসা আছে। এখানে গাছপালা ঝোপঝাপ জঙ্গল নেই। কাজেই এখানকার সাংঘাতিক জীবজন্তুরা খুব সম্ভব এদিকে-বড়-একটা বেড়াতে বা শিকার খুঁজতে আসে না এবং কখনও-সখনও এলেও কঙের তীক্ষ্ণ চোখের সামনে সহজেই তাদের ধরা পড়বার সম্ভাবনা! এইসব বুঝেসুঝেই বুদ্ধিমান কং হয়তো এখানে তার আস্তানা গেড়ে বসেছে।

শোভনের শরীর আর তার মনের বশে থাকতে চাইছে না। এখন বৈকাল। আজ খুব ভোর থেকেই তার শরীরের ওপর দিয়ে যেসব ধাক্কা চলে যাচ্ছে, অন্য কেউ হলে এতক্ষণ হয়তো এ সব সহ্য করতে পারত না। অন্য কেউ কেন, অন্য সময়ে সে নিজেই কি এতটা সইতে পারত; কেবল তার আদরের বোনের মায়ামাখা মুখখানিই এতক্ষণ তাকে দু-পায়ের ওপরে সোজা দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তার বোনের জন্যে আজ কত বিদেশি পর হয়েও প্রাণ দিলে, হয়তো আবার আরও কত লোক, প্রাণ দিতে আসছে! আর রক্তের টান

ভুলে এখন কি সে অমানুষের মতো বিশ্রাম করতে পারে? নিজের শরীরকে নিজে নিজেই ধমক দিয়ে সে ফের চাঙ্গা করে তুললে–দ্বিগুণ উৎসাহে বেগে কয় পা এগিয়েই সে আবার চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কী সর্বনাশ, তার খুব কাছেই ওই যে কং! অতিরিক্ত উৎসাহকে দমন করে আবার সে পিছিয়ে এল।

এমন সময়ে একটি দৃশ্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। পাহাড়ের ওপর মস্ত বড় একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে হুড় হুড় করে জল বেরিয়ে আসছে। পাহাড়ের গর্ভে নদী। শোভন মুখ ফিরিয়ে দেখলে, ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে খানিক দূরে গিয়ে নদীর জলধারা একটা জঙ্গলের কাছে মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।...এই দৃশ্য দেখে তখন আর কোনও কথা মনে হল না বটে, কিন্তু খানিক পরেই সে এক অদ্ভুত আবিষ্কার করলে!

ধীরে-ধীরে সে ক্রমেই ওপরে উঠছে। তারপর সূর্যের শেষ আলোকরেখা যখন আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাই-যাই হয়েছে, কং তখন পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরের তলায় এসে দাঁড়াল। সেখানে পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে চারিদিক থেকে খানিকটা নেমে গিয়েছে–মাঝখানে খানিকটা সমতল জায়গা ঠিক যেমন সার্কাসের গ্যালারির মাঝখানে থাকে খেলা দেখাবার খোলা জমি।

সেই সমতল জায়গাটার একপাশে রয়েছে পুকুরের মতো একটা জলাশয়! সেই পুকুরের দিকে কং সন্দেহপূর্ণ নেত্রে তাকিয়ে খানিকক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কী দেখছে কং? পুকুরের কালো জল তো স্থির হয়ে আছে–ওখানে জীবনের কোনও লক্ষণই নেই! খানিকক্ষণ জলের দিকে তাকিয়ে থেকে কং আবার এগিয়ে গেল। পুকুরের ওপরেই খাড়া-পাহাড়, এবং জল থেকে বিশ-পঁচিশ ফুট উপরেই সেই খাড়া-পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গুহা।

কঙের দেখাদেখি শোভনও পুকুরের দিকে তাকিয়ে রইল! অল্পক্ষণ পরে সে লক্ষ করলে, পুকুরের যেদিকে খাড়া-পাহাড় নেই, কেবল সেইদিকে জল যেন চক্রাকারে ঘুরছে। এর মানে কী? তবে কি পুকুরের তলায় জল বেরুবার কোনও পথ আছে?

ধাঁ করে শোভনের মনে পড়ে গেল সেই সুড়ঙ্গ-নদীর কথা। পুকুরের জল যেদিকে ঘুরছে, সেইদিকেই খানিক আগে সে যে সেই সুড়ঙ্গ-নদী দেখে এসেছে। এ এক মস্ত আবিষ্কার!

শোভন ভাবতে লাগল, আজ সকালে প্রান্তরের কাছে সে প্রথম যে নদী দেখেছে, তারপর থেকে সারা পথেই জমি ধীরে ধীরে ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠেছে। এই পাহাড়ের শিখরের কাছে এসে চড়াই শেষ হয়েছে।

এই পাহাড়ে পুকুরের জল যখন এক জায়গায় চক্রাকারে ঘুরছে, তখন পুকুরের নীচে নিশ্চয়ই জল বেরুবার একটা পথ আছে। সে পথ কোথায় গেছে? নিশ্চয়ই খানিক আগে দেখা সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে।

এবং জল যখন বেরুচ্ছে, অথচ পুকুর শুকিয়ে যাচ্ছে না, তখন জলের যোগান আসছে কোথা থেকে? পাতাল থেকে? নিশ্চয়ই পুকুরের তলায় গুপ্ত উৎস আছে। পাহাড়ের উপরকার অধিকাংশ সরোবর বা হ্রদের তলাতেই যা থাকে।

প্রান্তরের কাছে সেই যে নদী, এই পাহাড়ের শিখরেই তার উৎস। পাহাড়ের গা ক্রমেই ঢালু হয়ে যখন প্রান্তরের প্রায় কাছে গিয়ে নেমেছে, তখন জলের ধারাও এঁকে-বেঁকে ভীষণ ডাইনোসরের হ্রদ হয়ে নিশ্চয়ই একেবারে সেই প্রান্তরের নদীর ভিতর দিয়েই বয়ে গেছে! শোভনের এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কী আশ্চর্য ফল হয় একটু পরেই সেটা ভালো করে বোঝা যাবে। তার হিসাব খুব ঠিক। কেউ একটা ছোট নৈবেদ্যের আকারে মাটির পাহাড় বানিয়ে তার মাথায় জল ঢেলে পরীক্ষা করলেই দেখবে, সে জল একেবারে নীচে না গিয়ে পারবে না।

ওদিকে কং তখনও কেন যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পুকুরের পানে তাকিয়ে আছে, শোভন তার কারণ বুঝতে পারলে না! সে-ও বারকয়েক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুকুরের দিকে তাকাতে লাগল। একটু পরেই সে-রহস্যও স্পষ্ট হল। পুকুরের কালো জলের তলায় আরও বেশি কালো কী একটা যেন এঁকে-বেঁকে ওপরে উঠে আসছে! মোষের পেটের মতন মোটা একটা অজগর সাপ। কঙের সাবধানী চোখ আগেই তাকে দেখে ফেলেছে এবং সে-ও কংকে

দেখেছে। সে ভয়ানক সাপটা যে কত লম্বা, ভগবানই তা জানেন কিন্তু সে যখন জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে কংকে তেড়ে এল, তখনও তার দেহের নীচের দিকটা জলের ভিতরেই রইল।

ক্রুদ্ধ কং টপ করে এক হাত বাড়িয়ে পুকুরের উপরকার খাড়া পাহাড়ের গুহার ভিতরে মালবিকার দেহকে রেখে দিলে, তারপর মহাগর্জন করে প্রতি আক্রমণ করলে। তারপর সে কী ঝটাপটি! অজগরটা পাকে-পাকে কঙের সর্বাঙ্গকে নাগপাশে বেঁধে ফেললে, তারপর চেষ্টা করতে লাগল তাকে পুকুরের কালো জলে টেনে আনবার জন্যে! কং এবার খালি তার বজ বাহু দিয়ে নয়, তার বড় বড় ধারালো দাঁত দিয়েও লড়ছে! সেই রুদ্রমূর্তি কুমির-দানব যা পারেনি, এই আশ্চর্য জলচর অজগর সেই অসাধ্যই সাধন করলেনাগপাশের বাঁধনে কঙের দুই চক্ষু যেন ঠিকরে কপালে উঠল! সে তবু দুই হাতে অজগরের গলা টিপে রইল এবং বার বার কামড় দিয়ে অজগরের ভীষণ বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

দেহের সমস্ত শেষ শক্তি এক করে দেহের প্রত্যেক মাংসপেশি ফুলিয়ে কং অজগরের মাথাটা দুই হাতে আপনার বুকে চেপে ধরে একেবারে থেতলে ফেললে। অজগরের ল্যাজের দিকটা তখন ছটফট করতে করতে জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলকং এক পায়ে তাকে মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথাটা সজোরে পাহাড়ের ওপরে আছড়ে ফেললে! আবার দ্বীপের রাজা কঙের জয়। কিন্তু এবারে তার আর বিজয়-আনন্দ প্রকাশ করবারও শক্তি ছিল না–অজগরের নাগপাশ তার সেই বিরাট দেহকেও এমনি অবশ করে দিয়েছিল যে, সে টলতে টলতে মাটির ওপরে ধপাস করে বসে পড়ল। এমনকী, সেই বিশাল অজগরের যে বিপুল কুণ্ডলী তখনও তার চারিপাশে পাকিয়ে আছে, তার বাইরে গিয়ে বসবার শক্তিটুকুও কঙের তখন ছিল না। দুই চোখ মুদে পাহাড়ের গায়ে মাথা কাত করে রেখে ভোঁস-ভোঁস শব্দে সে হাঁপাতে লাগল।

শোভন দেখলে, এ এক সোনার সুযোগ! এমন সুযোগ সে হারালে না–পা টিপে টিপে কঙের পিছনদিক দিয়ে ওপরে উঠে শোভন সেই খাড়া-পাহাড়ের গুহার পাশে গিয়ে হাজির হল।

বাইরে যখন দুই মত্ত দানবের বিষম লড়াই বেধে গেছে, গুহার ভিতরে মালবিকার তখন আবার জ্ঞানোদয় হয়েছে। পাথরের ঠান্ডা, আদুড়-গা ছুঁয়ে সে ভাবলে, এ আবার আমি এলুম কোথায়? কং কোথায় গেল? বাইরেও মাতামাতি আর দাপাদাপি করছে কারা? আবার কি কোনও নতুন দানবের আবির্ভাব হয়েছে,–না ভূমিকম্প হচ্ছে?

গুহার মুখ খোলাই রয়েছে। বাইরে কী কাণ্ডকারখানা চলছে, সেটা একবার উঁকি মেরে দেখে আসবার জন্যে মালবিকার অত্যন্ত কৌতূহল হল, কিন্তু তার ভরসায় কুলালো না।

হঠাৎ গুহার মুখে কার ছায়া এসে পড়ল। মালবিকার বুকটা ধড়াস করে উঠল! পা টিপে টিপে চুপিচুপি এ আবার কোন নতুন শত্রু গুহার ভিতরে তাকে আক্রমণ করতে এল? মালবিকা ভয়ে সেদিকে তাকাতে পারলে না।

মালবি, মালবি শিগগির ওঠ!

এ যে তার দাদার গলা! কঙের গুহায় তার দাদা! অসম্ভব। সে কি ভুল শুনছে! সে স্বপ্ন দেখছে! সে পাগল হয়ে গেছে!

শিগগির শিগগির! মালবি, আমি এসেছি। যদি বাঁচতে চাস, এখান থেকে পালাতে চাস, তবে উঠে পড়–দেরি করিস নে!

দাদা, দাদা! আমার দাদা এসেছ?

চুপ! পরে দাদা বলে ডাকবার আর কথা কইবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। কং। এখনি আসবে, আর তাহলেই আমি মারা পড়ব। উঠে আয়!

কোথায় যাব?

গুহার ধারে আয়। ঠিক তলাতেই একটা পুকুর দেখতে পাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

তুই তো খুব ভালো সাঁতার আর ডাইভ করতে জানিস। এখান থেকে লাফিয়ে পুকুরে পড়তে পারবি?

পারব। কিন্তু তারপর? পুকুর তো ওইটুকু! আর ওইখানেই যে কং বসে আছে! আমরা পালাব কেমন করে?

সে কথা পরে বলব। এখন কংকে পুকুরের ধার থেকে সরাতে হবে। নইলে বলা যায় না তো, পুকুরের ভিতরে হাত বাড়িয়েই হয়তো সে আমাদের ধরে ফেলবে। তুই তৈরি হয়ে থাক। আমি বললেই লাফিয়ে পড়বি। আমি কংকে রাগিয়ে দি।

গুহার ধার থেকে বড় বড় পাথর তুলে নিয়ে শোভন ছুঁড়তে লাগল, কংকে টিপ করে! সঙ্গে-সঙ্গে সে যা মনে আসে তাই বলে চাঁচাতে লাগল–ওরে ছুঁচো কং! ওরে নেংটি ইঁদুর! ওরে ক্ষুদে খোকা! ওরে ধেড়ে পোকা! আয় এখানে, আমি তোর সঙ্গে আজ কুস্তি লড়ব!

দৈত্য কং তখনও কাতরভাবে হাঁপাচ্ছিল। দু-একটা পাথর গায়ে লাগতেই সে চমকে চোখ খুলে দেখে–আঁঃ ও কী ব্যাপার? তারই গুহার মুখে একটা মানুষ-পোকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁচাচ্ছে, আর লাফাচ্ছে, আর তাল ঠুকছে! যেখানে যমও ভয়ে ঢোকে না, সেখানে একটা বাজে মানুষ-পোকা তিড়িং বিড়িং করছে! এও কি সহ্য হয়?

হুঙ্কার দিয়ে লাফ মেরে কং দাঁড়িয়ে উঠল! নিজের সমস্ত কষ্ট ভুলে কালবোশেখির কালো মেঘের মতো কং রুদ্রমূর্তিতে গুহার পথে উঠতে লাগল।

আরে গেল! মানুষ-পোকাটা এখনও যে নাচে, ঢিল ছোড়ে, তাল ঠোকে! ওটা কি জানে না আমি হচ্ছি বিশ্বজয়ী রাজা কং আর ও গুহা হচ্ছে আমারই রাজবাড়ি, আর ওখান। দিয়ে পালাবার কোনও পথ নেই?

একটা ঢিল তার হাঁকরা মুখের মস্ত গর্তে ঢুকে তার গলায় গেল আটকে। মুশকিলে পড়ে সে খক খক করে খানিক কেশে ঢিলটাকে গলা থেকে বার করে দিলে। খুদে মানুষ পোকার নষ্টামি দেখে কং রেগে টং হয়ে উঠল! দুই হাতে বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে সে প্রায় গুহার কাছে এসে পড়ল।

আরে-আরে-ও কী? মানুষ-পোকা আর সেই জ্যান্ত পুতুলমেয়েটা যে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের ভরসা তো কম নয়-এখনি ডুবে মরবে যে!

গুহার ধারে মুখ বাড়িয়ে কং অবাক হয়ে দেখতে লাগল। সে-ও ওদের মতো জলে আঁপিয়ে পড়তে পারলে না, ওইখানেই তার হার। তার তালগাছ সমান দেহ নিয়ে সাধারণত নদী বা হ্রদ সে অনায়াসেই হেঁটে পার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সে জানে, পুকুরের গভীর জলে তার বিশাল দেহও থই পাবে না! পায়ের তলায় মাটি থাকলে কং অসম্ভবও সম্ভব । করতে পারে, কিন্তু অথই জলে সে সাঁতার কাটতে পারে না।

কিন্তু মানুষ-পোকা আর পুতুল-মেয়েটা তো ডুবল না। মাছের মতো সাঁতার কেটে ওরা যে পুকুরের ওপারের দিকে ভেসে যাচ্ছে! বটে! ওইদিকে গিয়ে ডাঙায় উঠে তোমরা আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে চাও? হুঁ, কং-এর হাত ছাড়িয়ে পালানো এত সোজা নয়,দাঁড়াও মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি।

কং আবার লাফিয়ে লাফিয়ে পুকুরের দিকে নেমে আসতে লাগল।

সাঁতার কাটতে কাটতে শোভন ও মালবিকা কঙের ওপরে দৃষ্টি রাখতে ভোলেনি।

শোভন বললে, মালবি! তাড়াতাড়ি! কং নীচে আসবার আগেই আমাদের ওপারের কাছে যেতে হবে!

মালবিকা বললে, কিন্তু ওপারে গিয়ে ডাঙায় উঠলেই তো কং আবার আমাদের ধরে ফেলবে!

আঃ, যা বলি শোনো না! কং আমাদের কিছুই করতে পারবে না!

কং যখন পুকুরের পাড়ে এসে নামল, শোভন ও মালবিকা তখন পুকুরের ওপারের কাছে এসে পড়েছে!

বড় বড় কয়েকটা লাফ মেরে কং ওপারে ডাঙার ওপরে গিয়ে হাজির হল। পুকুরের দুই দিকে তার দুই সুদীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে কং শোভন ও মালবিকার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল– তার তখনকার ক্রুদ্ধ চেহারা দেখলে বুকের রক্ত জল হয়ে যায়!

মালবিকা সভয়ে বলে উঠল, দাদা, এইবারেই আমরা গেলুম।

শোভন বললে, কোনও ভয় নেই। শোনো, যতটা পারো নিশ্বাস নাও। একেবারে পুকুরের তলায় ডুব দাও। এইখানে একটা বড় সুড়ঙ্গ আছে। নীচে গিয়ে সাঁতার কেটো না। হাত দুটো দিয়ে মাথা চেপে রাখো। এসো!

খুব জোরে একটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে শোভন ডুব দিলে। মালবিকাও তাই করলে।

খানিকটা নীচে নামতেই জলের ভিতরে তারা একটা প্রবল টান অনুভব করলে–এবং সেই টানে তাদের দেহ তিরবেগে ছুটে চলল–হয়তো কোনও অজানা মরণের দিকেই! তারা বেশ বুঝলে, জলের গতি যেদিকে, এখন হাজার বাধা দিলেও সেদিকে ছাড়া আর কোনওদিকে তাদের যাবার উপায় নেই। তাদের দেহ ঘুরতে-ঘুরতে জলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, এখন সামনে যদি কোনও বাধা থাকে, তাদের দেহ তাহলে কাচের পেয়ালার মতই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

এইবারে মালবিকার কষ্ট হতে লাগল। নিশ্বাস বন্ধ করে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে? এ ভেসে যাওয়ার শেষ কোথায়?–জলের টান কখন তাদের মুক্তি দেবে? আর বেশিক্ষণ এভাবে থাকলে দম বন্ধ হয়েই সে যে মারা পড়বে।

আচম্বিতে জলের টান খুব কমে গেল–মালবিকা দেখলে, আলোয় জলের ভিতরটা ধবধব করছে। তাড়াতাড়ি সে হাত দিয়ে জল কেটে পায়ের ঠেলায় নিজের দেহটাকে উপরপানে তুলে দিলে।

কী আনন্দ! ওই তো আকাশ পূর্ণিমার রূপোর মতন উজ্জ্বল! তার সামনেই ভেসে চলেছে শোভন। তারা এখন এক নদীর ভিতরে এবং নদীর দু-ধারে খালি পাহাড় আর বন।

মালবিকা খুব খুশি হয়ে বলে উঠল, দাদা, দাদা! এ আমরা কোথায় এলুম–কেমন করে এলুম?

শোভন বললে, পুকুরের তলায় সুড়ঙ্গ দিয়ে আমরা এই নদীতে এসেছি। এই নদীর জন্ম ওই পুকুরে। আর এই নদী গিয়ে পড়েছে একেবারে সেই প্রান্তরের কাছে। জলের যেরকম টান দেখছি, আমাদের খালি ভেসে থাকলেই চলবে! এখানে এসেছি স্থলপথে, কিন্তু এখন জলপথে তার চেয়ে ঢের সহজেই আমরা প্রান্তরের কাছে গিয়ে পড়ব।

মালবিকা বললে, ওহো, কী মজা! কিন্তু দাদা, দৈত্য কং আমাদের পিছনে-পিছনে তেড়ে আসছে না তো?

শোভন বললে,কং যাই-ই হোক, সে পশু ছাড়া আর কিছুই নয়! কী কৌশলে আমরা তাকে ফাঁকি দিলুম, হয়তো সে সেটা বুঝতেই পারবে না। আর, যদিও পারে, তবে তাকে আসতে হবে স্থলপথে, অনেক ঘুরে! সে সাঁতার জানে না; নদীর জল যেখানে খুব গভীর, সেখানে সে আসতে পারবে না। আমাদের আর ভয় নেই। কঙের ঢের আগেই আমরা প্রান্তরের কাছে গিয়ে পড়ব।

.

এগারো । কঙের প্রত্যাগমন

প্রান্তরের ওপর দিয়ে আবার নতুন একদল নাবিক খুলি-পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গে একখানা বোট, ঝুলোনো সাঁকো তৈরি করবার জন্যে রাশীকৃত দড়িদড়া, এবং আরও নানানরকম জিনিসপত্তর রয়েছে।

দলের আগে আগে দেখা যাচ্ছে কাপ্তেন ঈঙ্গলহন ও ডেনহামকে। এরা সবাই চলেছে মালবিকা ও শোভনকে উদ্ধার করতে।

কাপ্তেন বললেন, আমি খালি মিস সেন আর মি. সেনকে উদ্ধার করব না। আমি কংকেও বন্দি করবার চেষ্টা করব।

ডেনহাম বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, কেন? কংকে বন্দি করে কী হবে?

কাপ্তেন বললেন, আমাদের মুখের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি সভ্য জগৎকে দেখাতে চাই, কী ভীষণ দৈত্য এখনও এই পৃথিবীতে বাস করছে। আমাদের এই অদ্ভুত আবিষ্কারে সারা দুনিয়ায় হই-চই উঠবে,–আর লোকের মুখে-মুখে আমাদের নাম ফিরতে থাকবে, আমরা অমর হয়ে যাব!

ডেনহাম বললে, কং হবে মানুষের হাতে বন্দি! অসম্ভব! পাগলের প্রলাপ।

কাপ্তেন খাপ্পা হয়ে বললেন, পাগলের প্রলাপ! কেন?

ডেনহাম বললে, আপনি কংকে এখনও দেখেননি বলেই এই কথা বলছেন। সে এক সজীব পাহাড়! পিঁপড়েরা যদি বলে মানুষকে বন্দি করব,তাহলে সেটা কি তাদের পাগলামি হবে না? কঙের কাছে আমরা কীটপতঙ্গ-পিঁপড়ের মতোই তুচ্ছ!

কাপ্তেন বললেন, কিন্তু সে পশু, আর আমরা হচ্ছি মানুষ! মানুষের বুদ্ধির কাছে পশুকে হার মানতেই হবে। কংকে বন্দি করব বলে আমি অনেক বোমা এনেছি।

ডেনহাম বললে, বোমা আমাদেরও কাছে ছিল। তবু এতগুলো লোকের প্রাণ গেল!

সেটা তোমাদেরই বুদ্ধির দোষে!

মানলুম! কিন্তু বোমা ছুঁড়ে কংকে বড়জোর আমরা হত্যা করতে পারি। তাকে হত্যা করা এক কথা, আর জ্যান্ত অবস্থায় বন্দি করা অন্য কথা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বোমার সাহায্যেই কংকে বন্দি করব! এ যে-সে বোমা নয়,-গ্যাসের বোমা বিষাক্ত গ্যাসের বোমা।

ডেনহাম চমকৃত হয়ে মহা উৎসাহে একটা লক্ষ্য ত্যাগ করে বললে, কী আশ্চর্য! এই সোজা কথাটা তো এতক্ষণ আমার মাথায় ঢোকেনি। ধন্য আপনার বুদ্ধি! হ্যাঁ, বিষাক্ত বোমার ওপরে আর কোনও কথা নেই বটে!

কাপ্তেন হঠাৎ প্রান্তরের দিকে সচকিত চোখে তাকিয়ে বলেন, ওরা কারা? ওরা কারা এদিকে আসে? মানুষ! একটি মেয়ে, একটি ছেলে।

ডেনহাম আহ্লাদে আর এক লাফ মেরে বললে, আরে-আরে! ও যে মিস আর মিস্টার সেন! অ্যাঁ! এ কী কাণ্ড! অবাক!

শোভন ও মালবিকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

ডেনহামও তাদের দিকে ছুটে গিয়ে বললে, মিঃ সেন-

ছুটতে ছুটতেই বাধা দিয়ে শোভন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, সব কথা পরে শুনবেন। এখন পালিয়ে আসুন-ফটক বন্ধ করুন! কং আমাদের পিছনে-পিছনে আসছে।

কং!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পালিয়ে আসুন-পালিয়ে আসুন!

কং আসছে শুনে সকলেরই পিলে চমকে গেল। লাম্পি বলে একজন লম্বা-চওড়া নাবিক এতক্ষণ সঙ্গীদের কাছে বড়াই করতে করতে আসছিল যে, বোমা ছুঁড়ে কেমন করে সে কঙের মোটা ভুড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। এখন কঙের নাম শুনেই সকলের আগে সে ফটকের দিকে এমন লম্বা দৌড় মারলে যে, একবারও আর পিছন ফিরে চাইবার সময় পেলে না!

কেবল কাপ্তেন একবার বললেন, আসুক না কং! আমরা এইখানে দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করব।

ডেনহাম বললে, না, না, পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে! শিগগির পালিয়ে আসুন। বলেই ডেনহাম দৌড় মারলে! কং যে কী চিজ সেটা আর বুঝতে বাকি নেই।

দেখতে দেখতে প্রান্তর জনশূন্য হয়ে গেল!

ওদিকে উচ্চ প্রাচীরের ওপর থেকে অসভ্যরা আশ্চর্য দৃষ্টিতে দেখলে, তাদের রাজা কঙের বউ আবার ফিরে এসেছে। নিজেদের চোখকেই তারা যেন বিশ্বাস করতে পারলে না। রাজা কঙের বউ ফিরে এসেছে এমন অসম্ভব ব্যাপার সে-দেশে আর কখনও কেউ দেখেনি।

প্রান্তরের অরণ্যের ভিতর থেকে আচম্বিতে এক ভয়াবহ, বুক দমানো গুরুগম্ভীর গর্জন জেগে উঠল–সে-গর্জন শুনলে পাহাড়ের চূড়াও যেন খসে পড়ে!

.

বারো। কঙের বউ-খোঁজা

কং! কং! কং!-প্রাচীরের ওপর থেকে হাজার হাজার কণ্ঠে চিৎকার উঠল–কং! কং! কং!

প্রান্তরের ওপর পাঁচ-ছয়-তলা অট্টালিকার চেয়ে উঁচু কী-একটা মহাদানব বন্যার বেগে ধেয়ে আসছে চারিদিকে ধোঁয়ার মতন ধুলারাশি উড়িয়ে। প্রান্তরের বড় বড় গাছগুলোও তার বুক পর্যন্ত পৌঁছোয় না।

চিৎকার সমানে চলল–কং! কং! কং! কং! কং! কং! কং!

অসভ্যদের রাজার কি হুকুম হল–দলে দলে লোক ছুটে গিয়ে প্রাচীরের মস্ত বড় ফটকটা সশব্দে বন্ধ করে দিলে।

কিং! কং! কং! রাজা কং তার বউকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসছে!

কিন্তু ফটক বন্ধ হয়েও বন্ধ হল না। তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হবার আগেই কং তার হাতির দেহের চেয়েও মোটা একখানা প্রকাণ্ড পা ফটকের ফাঁকের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে– আর হুড়কো লাগানো অসম্ভব।

পাছে সে ভিতরে ঢুকে পড়ে, সেই ভয়ে শত শত মানুষ ফটকের দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। কং ভিতরে ঢুকলে কী অমঙ্গল যে ঘটবে, সকলেই তা জানে!

শোভন কাপ্তেনের দিকে ফিরে বললে, মি. ঈঙ্গলহর্ন, এই বিপদের ভিতরে আমার ভগ্নীর আর থাকা উচিত নয়। ওকে আগে জাহাজে পাঠিয়ে দিন!

কাপ্তেন সায় দিয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন মিঃ সেন! আচ্ছা, আমি এখনি সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তখন ফটকের ওদিকে কং, আর এদিকে শত শত অসভ্য মহা ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিয়েছে। কয়েকজন জাহাজি-গোরাও অসভ্যদের সঙ্গে যোগদান করলে।

আগেই বলেছি, কং তার পা দিয়ে ফটকটা ফাঁক করে রেখেছিল। হঠাৎ সেই ফাঁকের ভিতর হাত চালিয়ে সে একসঙ্গে দুজন অসভ্য ও একজন গোরাকে খপ করে মুঠোর

ভিতরে চেপে ধরলে এবং পরমুহূর্তেই সেই তিনজনের দেহ আকারহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত হল।

কং ফটকের ওপরে আবার এক প্রচণ্ড চাপ দিলে–সঙ্গে-সঙ্গে ফটকের উপরদিকের একটা অংশ সশব্দে ভেঙে পড়ল। তারপর সে এমন ধাক্কার পর ধাক্কা মারতে লাগল যে, ফটকের বাকি অংশও হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে দেরি লাগল না।

সমুদ্র-তীরে এসে দাঁড়াল যে প্রলয়ঙ্কর কালভৈরবের মূর্তি, তাকে দেখেই হাজার হাজার অসভ্য পঙ্গপালের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল! দুর্জয় ক্রোধে কং আজ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে; সে প্রত্যেকবার পা ফেলছে আর তার বৃহৎ পদের চাপে প্রতিবারই তিন-চারজন করে লোকের দেহ ভেঙে চটকে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে কী সে গর্জন! সেই গর্জন শুনেই অনেকে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে!

মানুষগুলো কে মরল, কে পালাল, আর কেই-বা বাঁচল সেসব দিকে কঙের আজ কোনও লক্ষ্যই নেই,–তার মুণ্ড চারিদিকে ঘুরছে, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চারিদিকে ফিরছে কিন্তু যাকে অন্বেষণ করছে, তাকে যেন পাচ্ছে না!

কং খুঁজছে মালবিকাকে! সে সেই পুতুল-মেয়েকে আবার নিজের বাসায় নিয়ে যেতে চায়! কিন্তু মালবিকা তখন জাহাজে।

এইবারে কং অসভ্যদের গ্রামের দিকে ছুটল! সারি সারি কুঁড়েঘর। কং এক-একবার হাত ছোড়ে আর এক-একখানা ঘরের চাল উড়ে যায়–দেয়াল পড়ে যায়। কং অমনি সেই ঘরের ভিতরে হাত চালিয়ে যারা তার ভয়ে সেখানে গিয়ে লুকিয়েছিল, সেই খুদে-খুদে ঘৃণা মানুষ পোকাগুলোকে টেনে-টেনে বার করে আনে, শূন্যে তুলে তাদের ভালো করে লক্ষ করে দেখে– তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং কাতর আর্তনাদ করে সে অভাগারা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে মরে যায়! কান্নায় আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে গেল!

দেখতে-দেখতে অতবড় গ্রামের সমস্ত ঘর তাসের বাড়ির মতো ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল–তবু কং যাকে খুঁজছে, তাকে পেলে না! নিষ্ফল আক্রোশে সেই প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপের নিহত ও আহত দেহগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কং তখন ভয়ংকর চিৎকার করতে করতে বুক চাপড়াতে লাগল। সে চিৎকার জাহাজে মালবিকার কানেও পৌঁছোল। শুনে সে ভয়ে শিউরে উঠল, তবু কং আর তার মাঝখানে আছে সমুদ্রের তরঙ্গ, যার কাছে কঙের শক্তি ব্যর্থ!

গ্রামের বাকি সমস্ত লোক তখন উচ্চ প্রাচীরের ওপরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। প্রধান পুরোহিত ও তার চ্যালারা তখন কঙের মেজাজ ঠান্ডা করবার জন্যে সমস্বরে স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করলে! কিন্তু কং শান্ত হবে কি, মানুষ পোকাগুলো অমন একতানে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে শুনে সে আরও রেগে যেন তিনটে হয়ে উঠল! রেগে দৌড়ে গিয়ে সে পাঁচিলের ওপরে বার বার ধাক্কা মারতে লাগল। যখন দেখলে পাঁচিল একটু টলও না, তখন সুদীর্ঘ লাফ মেরে ওপরে উঠবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কঙের দেহ বিশাল হলেও দেড়শো ফুট উঁচু পাঁচিলে লাফিয়ে উঠবার শক্তি তার ছিল না। তখন সে বড় বড় পাথর ছুঁড়তে শুরু করলে। সেই পাথরের ঘায়েও অনেক লোক হত ও আহত হল।

ওদিকে একেবারে সমুদ্রের জলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল কাপ্তেন, শোভন, ডেনহাম ও নাবিকের দল। বেগতিক দেখলেই সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্যে তারা সবাই প্রস্তুত হয়েই আছে।

কঙের কাণ্ড দেখে শোভন বললে, মিঃ ঈঙ্গলহর্ন! আর তো এ দৃশ্য সহ্য হয় না। যত গণ্ডগোলের জন্যে অসভ্যরাই দায়ী বটে, কিন্তু তাদের যথেষ্ট শাস্তিই হয়েছে। ওরা অসভ্য হলেও মানুষ। আর কতক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে চোখের সামনে এমন নরহত্যা দেখব?

কাপ্তেন বললেন, কিন্তু আমরা কী করব বলুন! কং যেখানে আছে তার চারিদিকেই গাছপালা আর জঙ্গল। সে খোলা জায়গায় না এলে আমাদের বোমা ব্যর্থ হতে পারে। ওই অসভ্য বনমানুষগুলোকে বাঁচাতে গিয়ে শেষটা কি নিজেরাই বিপদে পড়ব?

কাপ্তেনের কথা ঠিক। শোভন আর কিছু বললে না।

এমন সময়ে হঠাৎ কং তাদের দেখতে পেলে। মালবিকার গায়ের রংয়ের মতন এদেরও গায়ের রং সাদা। তাহলে পুতুল-মেয়েটা নিশ্চয় ওদের দলে আছে। বোধহয়, এমনিধারাই কিছু ভেবে কং আবার গজরাতে-গজরাতে শোভনদের দিকে বেগে ছুটে এল।

কাপ্তেন তো তাই চান। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, সবাই হাতে এক একটা বিষাক্ত বোমা নাও। অতগুলো বোমা হয়তো দরকার হবে না, তবুও বলা তো যায় না সাবধানের মার নেই!

মুর্তিমান বিভীষিকার মতো কং তেড়ে আসছে–তার হাঁ করা মুখের ভিতর থেকে দাঁতগুলো ঠিক ইস্পাতের ছোরার মতন চকচক করছে, তার হাত দুখানা বড় বড় থামের মতন আকাশের দিকে উঠে গেছে, তার সমস্ত দেহখানা রাগের আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে।

কাপ্তেন বীরবিক্রমে কঙের দিকে ছুটে এগিয়ে গেলেন। একটা নগণ্য মানুষ-পোকাকে দম্ভভরে এগিয়ে আসতে দেখে কং আরও বেশি খাপ্পা হয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। পায়ের কড়ে আঙুলের টিপুনিতে যার নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়ে, সে চায় তার সঙ্গে লড়াই করতে! কী আস্পর্ধা!

কাপ্তেন তার দিকে টিপ করে বিষাক্ত গ্যাসের বোমা ছুড়লেন। বোমাটা কঙের আসবার পথের ওপরে পড়ে গর্জে উঠল। কং অবাক হয়ে ভাবলে, ওই একরত্তি জিনিস এতজোরে চাঁচাতে পারে।

বোমার ধোঁয়ায় কঙের বিরাট দেহও ঢেকে গেল। সেই ধোঁয়ার বিশ্রী গন্ধটা তার মোটেই পছন্দ হল না–সে ভয়ানক কাশতে লাগল।

তারপর শোভন এবং তারপর ডেনহামও তার দিকে এক একটা বোমা নিক্ষেপ করলে। ধোঁয়া যেন পুরু মেঘের মতন কংকে গ্রাস করে ফেললে!

কাপ্তেন বললেন, ব্যস! দেখো, কী হয়! আর বোধহয় বোমা ছুঁড়তে হবে না!

বোমার ধোঁয়ার ভিতর থেকে কং যখন বেরিয়ে এল, তখন তার আগেকার তেজ আর নেই। তার পা দুটো তখন মাতালের মতন টলমল করছে, মুণ্ডটা থেকে-থেকে কাঁধের ওপর কাত হয়ে পড়ছে এবং ক্রমাগত কাশির ধমকে তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু সমুদ্রের তীরে সুদীর্ঘ কালো ছায়া ফেলে প্রচণ্ড কুম্ভকর্ণের মতো কং আসছে-আসছে তবু আসছে! ভয় কাকে বলে তা সে জানে না!

কাপ্তেন বিপুল বিস্ময়ে বললেন, এই একটা বোমা একদল মানুষকে অজ্ঞান করে দিতে পারে, কিন্তু ওই আশ্চর্য দৈত্যটা তিন-তিনটে বোমা হজম করে ফেললে, আচ্ছা, বন্ধু, আমরা এখনও ফতুর হইনি,-এই নাও, তোমাকে আর একটা বোমা উপহার দিলুম। আশা করি, এইবারে তুমি লক্ষ্মীছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়বে?

চতুর্থ বোমাটা করে বুকের ওপরে দড়াম করে ফেটে আবার রাশি রাশি ধোঁয়া বমন করলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর থেকে খানিকটা জলীয় বিষ তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল! কং আর-এক পাও চলতে পারলে না, তার চোখ তখন অন্ধ এবং দমও যেন বন্ধ হয়ে গেল, তবু কোনওরকমে একটা মানুষ-পোকাকে ধরবার জন্যে সামনের দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে সমুদ্রতীরের বালির ওপরে ধপাস করে সটান সে পড়ে গেল।

শোভনের মনে হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হিড়িম্বা-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচও বোধহয় এমনি করে ধরাশায়ী হয়েছিল।

ডেনহামের মনে হল, তার সামনে যেন বিশ-পঁচিশটা হাতি পাশাপাশি মরে পড়ে রয়েছে।

কাপ্তেন হাঁক দিলেন, শিগগির মোটা লোহার শিকল দিয়ে ওর সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেলো। ভয় হচ্ছে? আর কোনও ভয় নেই কং এখন অন্তত তিন-চার ঘণ্টা খুব আরাম করে ঘুমোবে-একটা আঙুলও নাড়তে পারবে না। আমার বোমার গুণ কত!...তাড়াতাড়ি একটা বড় ভেলা তৈরি করে ফেলো! কঙের ওই ছোট্ট খোকার মতো দেহখানি তো জাহাজে তোলা

চলবে না, জাহাজের সঙ্গে ভেলায় করে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে! যাও, যাও, ভ্যাবাকান্তের মতো হাঁ করে দেখছ কী?

শোভন বললে, কঙের কাছে লোহার শিকল হয়তো ফুলের মালার মতন পলকা! ও কি বাঁধা থাকতে রাজি হবে?

কাপ্তেন বললেন, রাজি হয় কি না হয়, সেটা পরে বোঝা যাবে! কং, কং, কং! রাজা কং! সবাই কংকং করে ভয়েই সারা! এই দ্বীপেই সে রাজা, সভ্য দেশে সে পশু মাত্র! যে-কোনও পশুকে মানুষ একটা মস্ত বড় শিক্ষা দিতে পারে। সেটা হচ্ছে ভয়! মানুষ হাতি, বাঘ, সিংহকে বশে রেখেছে এই ভয় দেখিয়েই। কংকেও আমরা শিখিয়ে দেব, ভয় কাকে বলে! তারপর সে বশ মানে কি না দেখা যাবে! লোহার শিকলে নয়, ভয়ে এই পশু কং আমাদের গোলাম হয়ে থাকবে!

ওদিকে পাঁচিলের ওপর থেকে বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়ার মতন ডাগর করে অসভ্যরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল তাদের বিশ্ববিজয়ী রাজা কংকে ওই বিদেশিরা লোহার শিকলে বেঁধে ভেলায় করে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান পুরোহিত ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, ভেটো খোটা হোটো খোটা ঘংচা।

রাজাও চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, হাভা ডাভা খাভা তাভা খোংখু!

এ-সব কথার মানে কী জানি না। বোধহয় খুবই দুঃখ-শোকের কথা!

কাপ্তেন শোভনের পিঠ চাপড়ে বললেন, মি. সেন! আপনি বীর বটে! রূপকথার রাজপুত্রের মতো আপনি এই দৈত্যটার হাত থেকে আপনার ভগ্নীকে উদ্ধার করে এনেছেন!...এই কংকে নিয়ে আমি পৃথিবীর বড় বড় সব শহরে ঘুরে বেড়াব, আর আপনার সম্মানের জন্যে সর্বপ্রথমে যাব কলকাতা শহরেই!

.

তেরো। ‘পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য’

সারা কলকাতার লোক আজ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের এক মাঠের দিকে সমুদ্রের তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতন ছুটে চলেছে!

সারা কলকাতার ছোট-বড় বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে সচিত্র বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে একটা গগনস্পর্শী গরিলার ছবি এবং তার তলায় মস্ত বড় হরফে লেখা রয়েছে–

রাজা কং, পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়।

সারা কলকাতায় সমস্ত ছেলে-মেয়ে আজ প্রতিজ্ঞা করেছে, রাজা কংকে স্বচক্ষে না দেখে, কেউ আর ইস্কুলের কোনও কেতাব স্পর্শ করবে না।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেসব ট্রাফিক কনস্টেবল পাহারা দেয়, মানুষের ভিড়ের চোটে আর গাড়ির ঠেলায় অস্থির হয়ে তারা রাজা কঙের উদ্দেশে অভিশাপ বৃষ্টি করছে।

রাজা কংকে আজ তিনবার দেখানো হবে! কলকাতার কোনও বায়োস্কোপ ও থিয়েটারে আজ একখানাও টিকিট বিক্রি হয়নি। ক্যালকাটা-মোহনবাগানের খেলার মাঠে চেঁচিয়ে গলা ভাঙবার, হাততালি দেবার ও রেফারিকে গালাগালি দিয়ে খুশি হবার জন্যে একজন লোকও যায়নি।

খবরের কাগজওয়ালাদের মুখে আজ হাসি আর ধরছে না। মালবিকার বিপদের ও শোভনের বীরত্বের কাহিনি ছাপিয়ে কাগজওয়ালারা আজ যত কাগজ বিক্রি করেছে, সারা বছরেও তত বিক্রি হয় না।

মাঠে আজ মস্ত তাঁবু পড়েছে এবং তাঁবুর ভিতরে-বাইরে জনতার মধ্যে কেবল হাজার হাজার কালো মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তিনবারের প্রদর্শনীর সমস্ত টিকিটই

বিক্রি হয়ে গেছে। ধুমধামপুরের জমিদার দুমদাম দে এবং প্যানপ্যানগড়ের মহারাজ ভ্যান ভ্যান সিং নাকি এক-একখানি টিকিটের জন্যে যথাক্রমে পাঁচশো ও হাজার টাকা দিতে চেয়েও একটুখানি দাঁড়াবার ঠাঁই পর্যন্ত পাননি।

ফুলস্টপ কোম্পানির বড় সাহেব মিঃ সেমিকোলন ও তাঁর স্ত্রী মিসেস কমা রাজা। কংকে দেখবার আগ্রহে চল্লিশ টাকার একখানি বক্স অতি কষ্টে কিনতে পেরেছিলেন। তাঁবুর ভিতরে এসে দূর থেকে রাজা কঙের গর্জন শুনেই তাঁদের কান নাকি কালা হয়ে গিয়েছে। এবং পাছে রাজা কংকে দেখলে চোখ তাঁদের কানা হয়ে যায়, সেই ভয়ে নাকি তারা চোখে ঠুলি পরবার জন্যে আবার বেরিয়ে গেছেন!

ভিড়ের জন্যে চৌরঙ্গির মোড় পার হতে না পেরে তিতুরাম তাঁতি সেইখানেই পঁচিশ ত্রিশজন শ্রোতার কাছে রীতিমতো আসর জমিয়ে বলছে–ভায়ারা, রাজা কং সোজা লোক নন! তিনি তাঁর দেশে শুয়ে যখন ঘুমোতেন, বুঝলে কিনা–তাঁর ঠ্যাং থাকত পাতালে, ধড় থাকত পৃথিবীতে, আর বুঝলে কিনা মুণ্ডুটা থাকত আকাশের চাঁদের পাশে!

একজন অবিশ্বাসী শ্রোতা বললে, তাহলে ওইটুকু তাঁবুতে তিনি কেমন করে মাথা গুঁজে আছেন?

তিতুরাম তাঁতি একগাল হেসে বললে, আরে মুখ, তাও জানো না! রাজা কং যে- বুঝলে কিনা-তোর বীর হনুমানের ভায়রা-ভাই! হিঁদুর বেটা হয়ে তুমি কি এ-ও শোনোনি যে, হনুমানজি ইচ্ছে করলেই কড়ে আঙুলটির মতন ছোট্টটি হতে পারতেন? রাজা কংও সেই বিদ্যে জানেন, ছোট তাবুতে ছোটটি হয়ে আছেন।

একজন মাড়োয়ারি ভুড়ি চুলকোচ্ছিল, হনুমানজির নাম শুনেই ভুড়ি চুলকানো ভুলে, উদ্দেশে প্রণাম করে বললে, হাঁ বাবুসাব, ও বাত ঠিক হ্যায়!

আর একজন তিতুরামকে শুধোল, এত খবর তুমি কোথা থেকে পেলে?

তিতুরাম তাঁতি ফিক করে আবার একটু হেসে বললে, খবর কি অমনি পাওয়া যায় ভায়া, খবর রাখতে হয়। আমি খবর পাবো না তো খবর পাবে কে? আমার শাশুড়ির বোনঝির মামিশাশুড়ির বোনঝি যে–বুঝলে কিনা–ওই শোভন ছোকরার পিসেমশাইয়ের মামাশ্বশুর বাড়িতে বুঝলে কিনা কাপড় বেচতে যান!

এত বড় প্রমাণের পরে আর কথা চলে না। অতএব সবাই তিতুরাম তাঁতিকে একজন সত্যবাদী লোক বলেই মেনে নিলে।

শহরের হাটে-মাঠে-বাটে এমনি নানানরকম গুজবের অন্ত নেই। সকলের ভাগ্যে রাজা কঙের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা তো ঘটল না, কাজেই আজ কং সম্বন্ধে যে যেমন কথাই বলুক না কেন, সকলেই তা বিশ্বাস করে খুশি হচ্ছে!

কিন্তু আজ কাপ্তেন ঈঙ্গলহর্নের চেয়ে বেশি খুশি কেউ নয়। তিনি ব্যাপার দেখে স্থির করেছেন, এইবারে জাহাজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর শহরে-শহরে কংকে দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করবেন।

ডেনহামকে ডেকে তিনি বললেন, আর তুমি ছোকরা হবে আমার ম্যানেজার। আমার যা লাভ হবে, তা থেকে তুমি দু-আনা অংশ পাবে। আমি একলাই সব টাকা হজম করতে চাই না।

ডেনহাম হেসে বললে, বেশ, ওসব কথা নিয়ে পরে আলোচনা করব। কিন্তু আপাতত যে ভারী বিপদ উপস্থিত!

কাপ্তেন ব্যস্ত হয়ে বললেন, বিপদ! কীসের বিপদ? কং কি খাঁচার দরজা ভেঙে ফেলেছে?

ডেনহাম বললে, না, আজ সে দরজা ভাঙেনি–তবে পরে একদিন হয়তো ভাঙবে।

তবে আবার বিপদ কীসের?

মিঃ সেন আর মিস সেন দর্শকদের সামনে আসতে রাজি হচ্ছে না!

কেন? আমি তো স্বীকার করেছি, তাদের বীরত্বের পুরস্কারের জন্যে আজ টিকিট বিক্রির সব টাকা তাদেরই আমি উপহার দেব!

ডেনহাম ঘাড় নেড়ে বললে, না, না সেজন্যে তাদের আপত্তি নয়! টিকিট বিক্রির টাকা তাঁরা চান না। তাঁরা বলছেন, এমনভাবে সকলের সামনে আসতে তাদের লজ্জা করছে!

ডেনহামের পিঠে এক আদরের চড় মেরে কাপ্তেন বললেন, ওঃ, এইজন্যে তুমি এত ভাবছ? কোনও ভাবনা নেই, তাদের এখানে নিয়ে এসো, আমি ঠিক রাজি করাব।

ডেনহাম বেরিয়ে গেল এবং শোভন ও মালবিকাকে নিয়ে আবার ফিরে এল।

কাপ্তেন বললেন, আপনারা দর্শকদের সামনে আসতে রাজি নন কেন?

শোভন বললে, কারণ তো মি. ডেহামকে আগেই বলেছি।

কাপ্তেন বললেন, তাহলে আমার মান কোথায় থাকবে? সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, আজকের প্রদর্শনীতে এলে সবাই আপনাদেরও দেখতে পাবে। আপনাদের একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে আজ কত লোক টিকিট কিনেছে, আপনারা কি সে-খবরটা রাখেন? কঙের সামনে দাঁড়িয়ে, কেমন করে তাকে ধরা হল যখন সেই গল্প বলা হবে, তখন লোকে আপনাদের খুঁজবে। কিন্তু তখন আমি কী বলব?

শোভন বললে, আপনি টিকিট বিক্রি করছেন বলেই তো আমাদের আপত্তি।

কেন? আজকের টাকা তো আমি নিজের পকেটে পুরছি না। এ সবই তো আপনাদের!

শোভন একটু বিরক্ত স্বরে বললে, আমাদের আসল আপত্তি তো সেইজন্যেই! আমরা কি থিয়েটারের অভিনেতা, না সার্কাসের খেলোয়াড় যে, টাকার লোভে লোকের কৌতূহল মেটাতে আসব? না, মিঃ ঈলহন, আমাদের দিয়ে একাজ হবে না!

কাপ্তেন মুশকিলে পড়ে হতাশভাবে বললেন, তা হলে আমার কী উপায় হবে? লোকে যে আমাকে মারতে আসবে!

কাপ্তেনের মুখ দেখে মালবিকার মায়া হল। খানিকক্ষণ ভেবে সে বললে, আচ্ছা, যখন অন্য উপায় নেই, তখন কী আর করা যাবে? তবে আমরা এক শর্তে রাজি হতে পারি। আজকের টিকিট বিক্রির এক পয়সাও আমরা নেব না। কী বল দাদা?

শোভন বললে, এ প্রস্তাব তবু মন্দের ভালো।

কাপ্তেন বললেন, খামোখা এতগুলো টাকা ছেড়ে দেবেন? শোভন বললে, টাকার লোভে আমরা মনুষ্যত্ব বিক্রি করতে পারব না।

কাপ্তেন উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, সাধু! সাধু! আপনাদের যতই দেখছি, আপনাদের ওপরে আমার শ্রদ্ধা ততই বেড়ে উঠছে। এইবার চলুন–প্রথম প্রদর্শনীর সময় হয়েছে।

.

চোদ্দো । কঙের জাগরণ

কং বসে আছে। কিন্তু আজ আর সে রাজা কং নয়! বেজায় মজবুত ইস্পাতের খাঁচার ভিতরে, সর্বাঙ্গে ইস্পাতের শিকলের বাঁধন নিয়ে পর্বতের ভেঙে পড়া শিখরের মতো স্তব্ধ হয়ে, হেঁট মাথায়, ম্রিয়মাণ মুখে সে বসে আছে। মোটা লোহার চেনে তার প্রকাণ্ড হাত ও পা বাঁধা। সমস্ত দেহের মধ্যে মাঝে-মাঝে নড়ছে কেবল তার চোখ দুটো।

তাকে দেখলে দুঃখ হয় সত্য-সত্যই। কী অধঃপতন! আকাশছোঁয়া সেই খুলি-পাহাড়ের শিখর। সে ছাড়া আর কোনও জীবজন্তুর ছায়া সেখানে পড়েনি! তার ওপর দিয়ে বয়ে যেত মেঘের সার আর ঝোড়ো হাওয়া এবং নীচে দিয়ে বয়ে যেত অনন্ত মহাসাগর! সেইখানে বসে-বসে কং তার দ্বীপ-রাজ্য শাসন করত। অরণ্যবাসী ভয়ংকর সব দানব

জন্তু–যাদের লাঙ্গ এলের আঘাত লাগলে বড় বড় শাল, তাল, দেবদারু গাছ ধুলো হয়ে উড়ে যায়, যাদের পায়ের ভারে মেদিনী টলমল করে, কঙের বলিষ্ঠ বাহু তাদেরও দর্প চূর্ণ করেছে। যেসব পুঁচকে মানুষপোকাগুলো তাকে খুশি রাখবার জন্যে পূজা করত, বৎসরে-বৎসরে বউ যোগাত, কং একটা নিশ্বাস ফেললে, হয়তো যারা ঝড়ের তোড়ে শুকনো পাতার মতো হুস করে কোথায় উড়ে যায়, দৈব-বিড়ম্বনায় আজ কিনা সেই ঘৃণ্য কীটগুলোই তাকে কুকুর-বিড়ালের মতো বেঁধে রেখে দিয়েছে, পরম অবহেলা-ভরে তার সুমুখ দিয়ে আনাগোনা করছে। যদিও এই পোকাগুলোর ভাষা সে জানে না, তবু এটুকু তার বুঝতে বাকি থাকছে না, প্রায়ই তাকে একটা তুচ্ছ জীব ভেবে তারা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশা করে, তাকে টিটকিরি দেয়! হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙও তাই নিয়ে কৌতুক বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না। হায় রে অদৃষ্ট!....

কয়েকজন খবরের কাগজের রিপোর্টারকে নিয়ে কাপ্তেন এলেন, তার পিছনে-পিছনে ডেনহাম, শোভন ও মালবিকা।

মালবিকা সহজে সেখানে আসতে রাজি হচ্ছে না, বলছে, না মি. ডেনহাম, আপনি জানেন না, কংকে দেখলেই আমার বুক ধুক ধুক করে, ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যায়!

ডেনহাম বললে, মিস্ সেন, আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। এর মধ্যে ইস্পাতের খাঁচা, শিকল আর চাবুকের মহিমায় কঙের সব জারিজুরি আর জাঁক আমরা ভেঙে দিয়েছি। এখন

সে পোষ খরগোশের মতো শান্ত হয়ে পড়েছে।

মালবিকা ভয়েভয়ে তার দাদার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল।

দেশবন্ধু পত্রের রিপোর্টার অনেক তফাতে দাঁড়িয়ে বললেন, বাঁদরটার শিকল বেশ শক্ত তো।

বঙ্গবীর পত্রের রিপোর্টার ক্যামেরা নিয়ে এসেছেন কঙের একখানা ফোটো তুলতে। কিন্তু তিনি ফোটো তুলবেন কি, কঙের চেহারা দেখে তারই দাঁতে দাঁত লেগে গেল!

যুবক ভারত-এর রিপোর্টার খাঁচার ভিতরে একবার উঁকি মেরেই তুষ্ট হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেলেন।

হঠাৎ বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠল। কানে বললেন, আর সময় নেই। কংকে দর্শকদের সামনে নিয়ে চলো।

খাঁচার তলায় ছিল চাকা। প্রায় দুশো কুলি এসে দড়ি দিয়ে হেঁইও জোয়ান হো বলে খাঁচাটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

তাঁবুর ভিতরে দর্শকদের আসনে তখন আর তিলধারণের ঠাঁই নেই।

এতক্ষণ সেখানে বাজে গোলমালে ও তর্কবিতর্কে কান পাতবার যো ছিল না কিন্তু এখন রাজা কং সশরীরে আসছেন শুনে, পৃথিবীর এই অষ্টম বিস্ময়-কে স্বচক্ষে দেখবে বলে, সকলে রুদ্ধশ্বাসে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

তারপর কঙের মূর্তি দেখে চারিদিকে বিস্ময়ের যে বিপুল চিৎকার উঠল, তা বর্ণনা করা যায় না। প্রথম কয়েক সারে বেশি দামি আসনে যেসব ধনী বাঙালি ও সাহেব-মেম বসে ছিল, তারা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে পিছনে সরে গেল। অনেক মেম মূর্ছিত হয়ে পড়ল, এবং সমস্ত বালক-বালিকা এক তানে কান্নার কৎসার্ট শোনাতে শুরু করলে।

তবু করে দাঁড়ানো মূর্তির ভয়ানক ভাবটা কেউ দেখতে পেলে না,কারণ খাঁচার ভিতরে কং জড়োসড়ো হয়ে মাথা হেঁট করে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল!

এমন সময়ে দর্শকদের আগ্রহে ও অনুরোধে কাপ্তেনসাহেব শোভন ও মালবিকাকে এনে খাঁচার পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

এতক্ষণ কং টু-শব্দটিও করেনি। তার অত্যন্ত নির্বিকার ভাব দেখে কাপ্তেন-সাহেব স্থির করেছিলেন যে, সে ভয়েই এমন চুপ মেরে আছে।

কিন্তু এখন, মালবিকা যেমনি খাঁচার পাশে এসে দাঁড়াল, কং অমনি চমকে মুখ তুলে বাজের মতন চেঁচিয়ে উঠল!

পরমুহূর্তে সেই মস্ত তাবুর আধখানা খালি হয়ে গেল। দর্শকরা আঁতকে উঠে এ-ওর ঘাড়ে পড়ে তিরের মতন বেগে পালাতে লাগল! যারা অত্যন্ত সাহসী তারাও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল–এবং তাদেরও ভাব দেখলে বোঝা যায়, আর একটু বাড়াবাড়ি হলে তারাও পলায়ন করবার জন্যে রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই আছে।

কাপ্তেন গলা তুলে বললেন, ভদ্রমহোদয়গণ ও মহোদয়গণ! আপনারা মিথ্যা ভয় পাবেন না। কারণ, কঙের শিকল ক্রোম স্টিলে প্রস্তুত–এ শিকল ছেঁড়া অসম্ভব।

মালবিকার মুখও তখন ভয়ে সাদা হয়ে গেছে! একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে সে-ও কয়েক পা পিছিয়ে এল।

শোভন তার কানে কানে বললে, সবাই জানে আমরাই কংকে বন্দি করে এনেছি। মালবি, এত লোকের সামনে ভয় পেও না, সবাই ঠাট্টা করবে।

কঙের হাত-পায়ের শিকলগুলো হঠাৎ ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল।

মালবিকা বললে, দাদা, কঙের চোখ দেখ! ও কীরকমভাবে আমার পানে তাকিয়ে আছে। কাপ্তেনকে বলো,–ওঁর যা বলবার, তাড়াতাড়ি সেরে নিন; নইলে হয়তো আমি অজ্ঞান হয়ে যাব!

শোভন বললে, মি. ঈঙ্গলহর্ন, আর দেরি করবেন না, যা বলতে হয় চট করে বলে ফেলুন। আমার ভগ্নী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন!

কাপ্তেন আবার গলা তুলে বললেন, ভদ্রমহোদয়গণ ও মহোদয়গণ

শিকলগুলো এবার বড় জোরে বেজে উঠল,কাপ্তেন স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন কঙের হাত ও পা থেকে শিকলের বাঁধন খুলে পড়েছে। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন-ডেনহাম! ডেনহাম। শিগগির কুলিদের ডাকো।

কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখে রইল শূন্যে মুখ তুলে কং আর একবার বিকট গর্জন করে আচম্বিতে উঠে দাঁড়াল এবং সঙ্গে-সঙ্গে সেই মজবুত ইস্পাতে তৈরি ছাদ ঝনঝনিয়ে বেজে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কঙের মাথা তখন প্রায় তাবুর ছাদে গিয়ে ঠেকল।

তাঁবুর দরজার কাছে দর্শকদের ভিতরে তখন রীতিমতো যুদ্ধ বেধে গেছে-কে আগে পালাবে তাই নিয়ে। অনেকে ভিড়ের ধাক্কা সইতে না পেরে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল-পিছনের লোকেরা তাদেরই দেহ পায়ে থেতলে এগিয়ে যেতে লাগল! ভীত চিৎকারে, আহতদের আর্তনাদে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে গেল!

ইতিমধ্যে শোভনও তাড়াতাড়ি মালবিকার মূর্ছিত দেহকে কাঁধে তুলে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডেনহাম একটা গ্যালারির তলায় আশ্রয় নিলে, কাপ্তেনও তার পিছনে-পিছনে গ্যালারির ফাঁক দিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলেন কিন্তু গ্যালারির দুই তক্তার মাঝখানে গেল তাঁর হৃষ্টপুষ্ট ভুড়িটা আটকে। অসহায়ভাবে দুই পা শূন্যে ছুঁড়তে ছুঁড়তে তিনি বললেন, ডেনহাম। আমাকে বাঁচাওকং আমাকে ধরলে বুঝি।

ডেনহাম প্রাণপণ শক্তিতে তাঁর দুই হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে কোনওরকমে তাকে ভিতরে টেনে নিলে!

দুই পদাঘাতে সমস্ত খাঁচা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে দৈত্য কং বাইরে এসে দাঁড়াল।

একজন সার্জেন্ট তাকে লক্ষ্য করে পাঁচ-ছয়বার রিভলভার ছুড়লে কিন্তু কং সে-সব। গ্রাহ্যও করলে না। সে একটানে সমস্ত তাঁবুটা ছিঁড়ে ওপরে আকাশের দিকে এক টুকরো

ন্যাকড়ার মতন উড়িয়ে দিলে এবং তারপর পায়ের তলায় কলকাতা শহরের দিকে সক্রোধে তাকিয়ে হুঙ্কারের পর হুঙ্কার দিতে লাগল।

.

পনেরো। কঙের কথা ফুরল

নিজের বাড়িতে ফিরে বিছানায় শুয়ে মালবিকা তখন কঁদছিল।

শোভন বললে, মালবি, তুই এত ভীতু, আমি তা জানতুম না!

মালবিকা বললে, দাদা, দাদা! আর আমি সইতে পারছি না। কং ছাড়া পেয়েছে। সে আবার আমাকে সেই দ্বীপে ধরে নিয়ে যাবে!

তার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে শোভন বললে, দূর পাগলি। সে তোর খোঁজ পেলে তো।

মালবিকা বললে, না দাদা, আমার মন বলছে, সে আবার আসবে।

হু, আসবে, না আরও কিছু। এটা অসভ্যদের দ্বীপ নয়, এ হচ্ছে কলকাতা শহর। এতক্ষণে কং হয়তো আবার গ্রেপ্তার হয়েছে।

তবুও মালবিকা প্রবোধ মানলে না, উ-উ করে কাঁদতে লাগল।

শোভন বললে, ভারি মুশকিলে পড়লুম দেখছি। কোথাও কিছু নেই, নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছে, তবু কচি খুকির মতো কান্না। আচ্ছা বাপু, একটু সবুর কর, আমি লালবাজারের থানায় টেলিফোন করে খবর এনে দিচ্ছি। কেমন, তাহলে ঠান্ডা হবি তো?

মালবিকা সজল চোখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না দাদা, তুমি যেও না-তোমার পায়ে পড়ি। আমি একা থাকতে পারব না।

যত বাজে ভয়! চুপ করে শুয়ে থাক, ফোন করে আমি এখনি আসছি বলতে বলতে শোভন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লালবাজারের সঙ্গে ফোনের যোগ করে শোভন বললে, হ্যাঁ, আমি হচ্ছি শোভন সেন। হ্যাঁ, আমারই ভগ্নীকে কং ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমার ভগ্নী বড় ভয় পেয়েছেন, পাছে কং আবার তাকে ধরে...কং আবার বন্দি হয়েছে তো? কী বললেন? বন্দি হয়নি? তবে সে এখন কোথায়? পাগলের মতো চৌরঙ্গির বাড়িতে-বাড়িতে ঘরে-ঘরে উঁকি দিয়ে দেখছে? কারুকে আক্রমণ করেছে কি? করেনি? তার পায়ের চাপে অনেক লোক মারা পড়েছে? সে থিয়েটার রোডের ভেতরে ঢুকেছে?...আচ্ছা, ধন্যবাদ।

রিসিভারটা যখন রেখে দিলে, শোভনের হাত তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। কং থিয়েটার রোডে ঢুকেছে। তাদের বাড়িও যে থিয়েটার রোডেই।

মালবিকাকে সাবধান করে দেবার জন্যে শোভন তাড়াতাড়ি তার ঘরে ছুটে এল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই দেখলে, মালবিকার বিছানা খালি, জানলার গরাদ ভাঙা এবং থামের মতন মোটা মোটা দুখানা কালো রোমশ পা, জানলার সামনে দিয়ে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে।

বেগে ছাদের ওপরে গিয়ে সে দেখলে, তার বাড়ির ছাদ থেকে কং খুব সহজেই লাফ মেরে থিয়েটার রোড পার হয়ে ওপাশের এক বাড়ির ওপরে গিয়ে পড়ল এবং তার হাতের চেটোয় রয়েছে মালবিকার অচেতন দেহ। পর মুহূর্তে আর এক লাফে কং একেবারে অদৃশ্য।

পাগলের মতন ছুটে রাস্তায় এসে শোভন দেখলে, সেখানে জনতার সীমা নেই। লরির পরে লরি ছুটে আসছে, তাদের ওপরে দলে দলে পাহারাওয়ালা...সার্জেন্ট ও মিলিটারি পুলিশের

পুলিশের একজন বড়কর্তা উত্তেজিত স্বরে বলছে, ও জানোয়ারটা অমন শক্ত চেন ছিড়লে কেমন করে? অমন ইস্পাতের চেন দিয়ে যুদ্ধের ট্যাঙ্ক পর্যন্ত আটকে রাখা যায়!..ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করো। শিগগির লম্বা মই নিয়ে তাদের লোকজনকে আসতে বলো। বদমাইশটা ছাদে-ছাদে লাফিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরও দেখছি ছাদে ছাদে তার সঙ্গে যেতে হবে।

আরও অনেক পুলিশের লোকের সঙ্গে মোটরে করে কাপ্তেনসাহেব ও ডেনহাম এসে হাজির।

শোভন বললে, মি. ঈঙ্গলহর্ন! কং আমার বোনকে নিয়ে পালিয়েছে।

দূরের একটা বাড়ির ছাদে কঙের বিশাল দেহ একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

পশুটা আবার চৌরঙ্গির দিকে যাচ্ছে। ওদিকে চলো, পথ সাফ করো!

মিলিটারি-পুলিশের অনেকগুলো বন্দুক একসঙ্গে গর্জন করে উঠল।

ডেনহাম তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গিয়ে বললে, সাবধানে বন্দুক ছোড়! কঙের হাতে এক মহিলা আছেন!

কিন্তু কোথায় কং? পুলিশের লরিগুলো বেগে পশ্চিম দিকে ছুটেছে।

একজন ট্যাক্সিচালক পশ্চিম দিক থেকে গাড়ি ছুটিয়ে আসছিল বা পালাচ্ছিল। একজন সার্জেন্ট তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কংকে দেখেছ?

সে বিস্ময়ে প্রায়-রুদ্ধস্বরে বললে, কে কং, তা আমি জানি না। কিন্তু আমি একটা তালগাছের মতো উঁচু ভূতকে পার্ক স্ট্রিটের এপাশের ছাদ থেকে ওপাশের ছাদে লাফিয়ে যেতে দেখেছি। বলেই সে আবার গাড়ি চালিয়ে পলায়ন করলে।

সবাই পার্ক স্ট্রিটের দিকে চলো–পার্ক স্ট্রিটের দিকে।

পুলিশ কমিশনার কাপ্তেনকে ডেকে শুধোলেন, মেশিনগানের বুলেট কি তোমার এই পোষা দৈত্যকে বধ করতে পারবে?

কাপ্তেন বললেন, অনেকগুলো মেশিনগান ছুড়লে ফল হলেও হতে পারে।

আচ্ছা, আগে তাকে কোণঠাসা করা যাক!

একজন সার্জেন্ট বললে, কিন্তু আমরা যে তার নাগালই ধরতে পারছি না।

দূর থেকে আবার অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ শোনা গেল।

ওরা বোধহয় তাকে দেখেছে। ওইদিকে গাড়ি চালাও।

গাড়ি পার্ক স্ট্রিট পার হতেই একজন পাহারাওয়ালা খবর দিলে, কং যাদুঘরের ছাদে গিয়ে চড়েছে!

যাদুঘরের কাছে গিয়ে দেখা গেল, কং সেখানেও নেই।

কমিশনার বললেন, হতভাগাটা আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারবে দেখছি। ও যে কোথায় যেতে চায়, কিছুই যে বোঝা যাচ্ছে না!

ডেনহাম বললে, আমার বোধহয় সে খুব-একটা উঁচু জায়গা খুঁজছে! কং পাহাড়ের জীব। উঁচুতে উঠতে পারলেই সে বোধহয় মনে করে, শত্রুরা তার কোনওই অনিষ্ট করতে পারবে না!

কমিশনার বললেন, খুব সম্ভব তাই। কং বোধহয় উঁচু জায়গাই খুঁজছে। তাহলে অক্টারলনি মনুমেন্টই হচ্ছে তার যোগ্য জায়গা!

একজন ইন্সপেক্টর বললে, রাস্তার ভিড় কর্পোরেশন স্ট্রিটের কাছে গিয়ে জমেছে! কং বোধহয় ওইখানেই আছে।

মোটরগুলো আবার ছুটল।

একটু গিয়েই এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল।

হোয়াইটওয়ে লেডল-র উঁচু গম্বুজের ওপর থেকে হাত-পা দিয়ে দেওয়াল জড়িয়ে বিরাট ও কৃষ্ণবর্ণ এক দৈত্যমূর্তি নীচের দিকে নেমে আসছে।

ডেনহাম বললে, কী আশ্চর্য! কং যে টিকটিকির মতো দেওয়াল বেয়ে নেমে আসছে!

কং খানিকটা নেমে এসেই পথের ওপর লাফিয়ে পড়ল। একবার চারদিকে চেয়ে দেখে মেঘগর্জনের মতন চিৎকার করলে। রাজপথের জনতা চোখের নিমিষে অদৃশ্য হয়ে গেল!

কং এক লাফে চৌরঙ্গি রোড পার হল। পথের পাশে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল, বিষম আক্রোশে কং সেখানা একহাতে তুলে নিয়ে ছোট্ট একটা দিয়াশলাইয়ের বাক্সের মতোই ছুঁড়ে ফেলে দিলে–গাড়িখানা শূন্যে ঘুরতে-ঘুরতে শোভাবাজারের খেলার মাঠের ওপরে গিয়ে পড়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল!

ততক্ষণে মেশিন-গান এসে পড়েছিল। জনকয় তোক সেই কলের কামান চালাবার উপক্রম করাতে কমিশনার বাধা দিয়ে বললেন, কামান ছুড়ো না। ওর হাতে একটি মহিলা রয়েছেন!

কঙের হাতের চেটোয় মালবিকাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির দেওয়াল বয়ে নামবার সময়েও কং তার এ হাতখানা ব্যবহার করেনি।

আরও গোটাকয়েক লাফকং একেবারে মনুমেন্টের কাছে গিয়ে হাজির!

কমিশনার বললেন, যা ভেবেছি তাই! দেখো, দেখো, জানোয়ারটা মনুমেন্ট জড়িয়ে কত তাড়াতাড়ি ওপরে উঠছে!

একজন ইন্সপেক্টর বললে, এখন উপায়? ওকে কেমন করে আমরা ধরব? সব চেয়ে মুশকিল হচ্ছে, ওকে গুলি করেও মারতে পারব না। তাহলে গুলি ওই মেয়েটির গায়ে লাগতে পারে!

কাপ্তেন বললেন, এরোপ্লেন আনলে কেমন হয়?

কমিশনার বললেন, ঠিক বলেছ। আমরা সেই ব্যবস্থাই করব। ওর কাছে যাবার আর কোনও উপায় নেই।

শোভন বললে, মি. ডেনহাম, আমাকে আর একবার করে কাছে যেতে হবে।

কেমন করে যাবেন?

আমি মনুমেন্টের ভিতর দিয়ে ওপরে উঠব। তাহলে হয়তো মালবিকাকে আবার বাঁচালেও বাঁচাতে পারি।

আচ্ছা, চলুন,আমি আপনার সঙ্গে যাব।

কং তখন মনুমেন্টের আধাআধি পার হয়ে গেছে। সে এক-একবার নীচের দিকে তাকায়, গর্জন করে, আবার ওপরে উঠে। তার চেহারা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে, উচ্চতার জন্যে।

শোভন ও ডেনহাম মনুমেন্টের নোংরা ও অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে লাগল। তাদের খালি ভয় হতে লাগল যে, কঙের প্রকাণ্ড দেহের ভার সইতে না পেরে মনুমেন্টের এই পুরোনো ইটের গাঁথুনি যদি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে! তাহলেই তো সব শেষ। কং মরবে, মরুকগে। কিন্তু সেইসঙ্গে মালবিকাও মরবে, তারাও বাঁচবে না! কঙের দেহের দাপট সইতে না পেরে মনুমেন্ট যেন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে, এটা তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই অনুভব করতে পারছিল।

মনুমেন্টের নীচেকার বারান্দায় এসেই তারা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কঙের বিপুল উদর তাদের দৃষ্টিসীমা একেবারে রোধ করে দিয়েছে! কঙের এত কাছে তারা আর কখনই আসেনি।

কং তার মস্তবড় দুই ঊরু ও পা দিয়ে মনুমেন্টের ওপর দিকটা জড়িয়ে বসে আছে– তার দেহের উপর-অংশ তারাও দেখতে পেলে না, এবং তার কোলের কাছে যে দুটো মানুষপোকা এসে দাঁড়িয়ে আছে, কংও সেটা মোটেই টের পেলে না!

বাইরে তিন-চারখানা এরোপ্লেনের গর্জন শোনা গেল! এবং এটাও বোঝা গেল যে, উড়োজাহাজগুলো কঙের খুব কাছে এসেই উড়ছে।

বোধহয় এই নতুন শত্রুর আবির্ভাবে কং ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে! আচম্বিতে তার একখানা মস্ত হাত নীচে নেমে এল, তার মুঠোর দেখা গেল মালবিকাকে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়ে কং বরাবরই মালবিকাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রাখে! এবারেও বোধহয় সেই কারণেই। সে মনুমেন্টের নিচেকার বারান্দায় মালবিকার অচেতন দেহকে শুইয়ে রেখে দিলে!!

কিন্তু কং জানতেও পারলে না যে, দুটো মানুষপোকা বারান্দা থেকে আবার তার পুতুল মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেল! শোভন আবার করে চোখে ধুলো দিয়ে মালবিকাকে উদ্ধার করলে।

চৌরঙ্গির মোড়ে তখন সারা কলকাতা শহর ভেঙে পড়েছে।

পা দিয়ে মনুমেন্ট জড়িয়ে বসে আছে রাজা কং, সগর্বে তার মাথাটা শূন্যে তুলে! তার চারিপাশ দিয়ে চারখানা উড়োজাহাজ ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করছে–আসছে আর চলে যাচ্ছে, আসছে আর চলে যাচ্ছে। কং ভাবলে, নিশ্চয় এগুলো কোনও অজানা উড়োজন্তু,–গর্জন করে তাকে লড়াই করতে ডাকছে! বেশ তো, লড়াই করতে সে কোনও দিনই পিছপাও হয়নি। এতক্ষণ হাতের সেই পুতুল-মেয়েটার জন্যেই তার যা কিছু ভাবনা ছিল, এখন সে

তাকে সরিয়ে রেখে হাত খালি করেছে। এইবার সে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। উড়োজাহাজের গর্জনের উত্তরে কংও দুই হাতে বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

কং দেখলে একটা উড়োজন্তু তার খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুতের মতো তার একখানা। হাত তার দিকে এগিয়ে গেল এবং পর মুহূর্তে উড়োজাহাজখানা চূর্ণ- বিচূর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে গোত্তা খেয়ে পড়ে গেল।

কঙের শক্তি ও বাহাদুরি দেখে সারা কলকাতা থ!

মাটিতে পড়বার আগে উড়োজাহাজের ভিতর থেকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। মানুষের চোখ যেমন কঙের মতন দানব দেখেনি, কঙের চোখও তেমনি এমন কোনও উড়ো জন্তু দেখেনি, যার মুখ দিয়ে এরকম হু-হু করে আগুন বেরোয়! সে কিছু ভড়কে গেল। বোধহয় ভাবলে, ভাগ্যিস–ও আগুন তার হাত কামড়ে দেয়নি! আগুন যে কী ভয়ানক কামড়ে দেয়, কং তা জানে!

আরে মোলো! একটা সঙ্গীর দুর্দশা দেখেও ও তিনটে উড়োজন্তু ভয় পেলে না! আবার তাকে জ্বালিয়ে মারতে আসছে! কং চটেমটে তাদের ধরবার জন্যে একবার এদিকে, আর একবার ওদিকে লম্বা লম্বা হাত বাড়াতে লাগল।

উড়োজাহাজগুলো এবার সাবধান হয়েছে তারা আর কঙয়ের নাগালের ভিতর এল না।

কিন্তু নাগালের বাইরে থেকেই এবারে তারা অব্যর্থ মৃত্যুবাণ ছাড়তে লাগল! একখানা করে উড়োজাহাজ কঙের কাছে আসে, এক সেকেন্ডের জন্যে থামে, সাংঘাতিক কলের কামান ছোঁড়ে, আর চোখের পলক পড়তে না পড়তেই সাঁৎ করে সরে যায়!

কং চেয়ে দেখলে, তার সারা দেহ বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে এবং তার দেহের রক্তস্রোত মনুমেন্টের মাথা রাঙা করে গড়িয়ে পড়ছে।

মেশিনগান, কং ও উড়োজাহাজের গর্জনে আকাশের বুক যেন ফেটে যাবার মতো হল।

কঙের দৈত্য দেহ মনুমেন্টের ওপর টলতে লাগল রক্তধারার সঙ্গে তার সমস্ত শক্তি যেন শরীর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু উড়োজগুলোর দয়া নেই। তাদের মৃত্যুভরা তপ্ত দংশন অদৃশ্যভাবে কঙের দেহের ওপর এসে পড়ছে।

ক্রোধোন্মত্ত কং শেষটা আর সহ্য করতে পারলে না হঠাৎ একখানা উড়োজাহাজকে ধরবার জন্যে সে শূন্যে এক মস্ত লম্ফ ত্যাগ করলে–উড়োজাহাজ আবার সাঁৎ করে তার হাতের সীমানার বাইরে বেরিয়ে গেল এবং মূর্তিমান একটা ধূমকেতুর মতন করে বিপুল দেহটা এসে ভীষণ শব্দে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল!

রাজা কং আর তার পুতুল-মেয়েকে দেখবার জন্যে চোখ মেলে তাকায়নি।